জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ২	সংখ্যা ২	১৪২৫
Year 2	Volume 2	2018

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
National Institute of Mass Communication Journal

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ২ সংখ্যা ২ ১৪২৫

Year 2 Volume 2 2018

উপদেষ্টা

মো. রফিকুজ্জামান

সম্পাদক

মো. মাসুদ করিম

নির্বাহী সম্পাদক

মো. সোহেল পারভেজ

সম্পাদনা পরিষদ

মহাপরিচালক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

উপ-সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

পরিচালক (প্রশি. অনু.)

উপ-পরিচালক (টিভি অনু. প্রশি.)

উপ-পরিচালক (দৃশ্যসজ্জা ও রেখা. প্রশি.)

উপ-পরিচালক (গবেষণা)

গ্রন্থাগারিক

সহকারি পরিচালক (চলচ্চিত্র প্রশি.)

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
National Institute of Mass Communication Journal
বর্ষ ২ সংখ্যা ২ ১৪২৫
Year 2 Volume 2 2018

সম্পাদক	:	মো: মাসুদ করিম
নির্বাহী সম্পাদক	:	মো: সোহেল পারভেজ
প্রকাশক	:	মহাপরিচালক জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	তোহফাতুল জান্নাত
কম্পিউটার কম্পোজ	:	মোছা: সাজেদা খাতুন
পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা	:	সংবেদ ৮৫/১, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
মূল্য	:	১০০.০০ (একশত) টাকা
Price	:	100.00 (One Hundred) Taka
পরিবেশক	:	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ
জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট
১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ, চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৫৫০৭৯৪২৮, ফ্যাক্স : +৮৮০২৫৫০৭৯৪৪৩
e-mail : dg@nimc.gov.bd
Website : www.nimc.gov.bd

Contact
National Institute of Mass Communication
125/A, Darus Salam, A. W. Chowdhury Road, Dhaka-1216
Phone : 55079428, Fax : +88 0255079443
e-mail : dg@nimc.gov.bd
Website : www.nimc.gov.bd

সম্পাদকীয়

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের গবেষণা সাময়িকীর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের সূচনালগ্নে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

এবার গবেষণা সাময়িকীতে মোট ৯টি লেখা মুদ্রিত হলো। দেশের প্রথিতযশা গবেষকগণ তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে অপরিমেয় অবদান রেখেছেন। প্রথম প্রবন্ধটিকে চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও চিত্রনাট্যকার শ্যামল দত্তের চলচ্চিত্রের ভাষা ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে নান্দনিক উপাদানসমূহ অন্বেষণের প্রচেষ্টা বলা যায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ এবং সহযোগী অধ্যাপক রফিকুজজামান পর্যালোচনা করেছেন খবরের আবরণে পত্র-পত্রিকার বিনোদন পাতায় যে তথ্যগুলো পাঠকের কাছে তুলে ধরা হয় তার উপযোগিতা নিয়ে। মৌলিক গবেষণামূলক তৃতীয় প্রবন্ধে ড. রওশন আরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। পরের লেখাটিতে গণমাধ্যমকর্মী ও লেখক কাজী আলিম-উজ-জামান নাগরিক সাংবাদিকতার বিশ্ব প্রেক্ষিত ও ক্রম প্রসার সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। পত্রিকার পঞ্চম লেখাটি একটি গবেষণা প্রবন্ধ। লেখক জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় কবির জীবনবোধ ও কাব্য-দর্শনের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। জনাব মাহফুজ সিদ্দিকী তাঁর লেখায় আলোকপাত করেছেন এদেশের চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার উদ্ভব এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন সহকারি অধ্যাপক অনন্ত মাহফুজ। Job Stress Among The Newspaper Reporters In Bangladesh নিয়ে লিখেছেন কাজী নাজমুল হুদা এবং Community Radio নিয়ে সর্বশেষ লেখাটি লিখেছেন মো. আবু সায়েম।

সাময়িকীর দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাই এ ইনস্টিটিউটের মহ-াপরিচালক জনাব মো. রফিকুজ্জামানকে এবং সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে। মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বক্ষণিক নির্দেশনা এবং সম্পাদনা পরিষদ সদস্যদের

প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরিচর্যার ফলে সাময়িকীটি যথাসম্ভব পরিচ্ছন্নভাবে মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছে। এ সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সাময়িকীর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মো. মাসুদ করিম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব)

সূচি

চলচ্চিত্রের ভাষা ও সৌন্দর্য ৯
শ্যামল দত্ত

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে বিনোদন পাতার আধেয় : তথ্য-উপযোগিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ ২৯
আবুল মনসুর আহাম্মদ
রফিকুজজামান

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ৪৯
ড. রওশন আরা

নাগরিক সাংবাদিকতা : সাংবাদিকতার মুক্ত দুয়ার ৬৭
কাজী আলিম-উজ-জামান

সৈয়দ শামসুল হকের জীবনবোধ ও কাব্যদর্শন : একটি পর্যেষণ ৭৯
মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

এ দেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্র ৯৫
মাহফুজ সিদ্দিকী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি ১১৩
অনন্ত মাহফুজ

Job Stress Among The Newspaper Reporters In Bangladesh ১৩১
Kazi Nazmul Huda

Community Radio
An Important Tool to Establish Digital Bangladesh ১৪৮
Md. Abu Sayem

চলচ্চিত্রের ভাষা ও সৌন্দর্য

শ্যামল দত্ত

সম্ভাবনার আরেক নাম চলচ্চিত্র

'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে–
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'–
সুন্দর হল সে'।...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতার মতোই এক অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে চলচ্চিত্রের প্রতিটি ফ্রেমে। একজন চলচ্চিত্রকার নিজের মনের রঙেই তাঁর চারপাশের পরিবেশ, এমন কি বিশ্বজগৎকেও রাঙিয়ে তুলতে পারেন। একজন কবি অথবা একজন চিত্রশিল্পীর মতোই শিল্পের ভুবনে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা। শব্দ-বাক্য অথবা রংতুলির বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একজন কবি বা চিত্রশিল্পী তাঁর ভাবনাকে পাঠক বা দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন। একইভাবে আলোছায়া আর শব্দ ও সংগীতের মধ্য দিয়ে একজন কুশলী চলচ্চিত্রকার সিনেমার পর্দায় দৃশ্যকাব্য তৈরি করেন। একজন চলচ্চিত্রকার একাধারে কবি, চিত্রশিল্পী, সংগীতজ্ঞ এবং আরও অনেক কিছু। কারণ, কবিতা বা ছবি একান্তই কবি অথবা শিল্পীর হৃদয় ও মননের প্রতিফলন। কিন্তু চলচ্চিত্র একসাথে প্রায় সব শিল্পমাধ্যমের সমন্বিত প্রকাশ। এ জন্য তার ব্যাপ্তি অনেক বড়। আর তাই 'Director's Media' নামে পরিচিত চলচ্চিত্রশিল্প অসংখ্য কলাকুশলীর মিলিত প্রয়াস হলেও সেটির কৃতিত্ব একান্তই নির্মাতার। কারণ, একজন নির্মাতা যেভাবে তাঁর ভাবনাকে পর্দায় মেলে ধরতে চান, শেষ পর্যন্ত সেভাবেই একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে।

জহির রায়হান

কী নেই চলচ্চিত্রে? সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সংগীত, অভিনয়, চারু ও কারুশিল্প, সূচিশিল্প–সবই আছে। অর্থাৎ শিল্পের নান্দনিকতার জন্য যেখানে যা প্রয়োজন, চলচ্চিত্র তাকেই আত্মস্থ করেছে। মাঝেমধ্যে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কেবল ব্যাখ্যা দিয়ে তা বোঝা বা বোঝানো সম্ভব নয়। যেমন সংগীতের অপূর্ব সুর-মাধুর্য কেবল অবাক হয়েই শুনতে হয়। কোনোভাবে সেই সুরের সাংগীতিক ব্যাখ্যা করা গেলেও হৃদয়ঙ্গম করতে হয় হৃদয় দিয়েই। ধরা যাক, গানের বাণীতে যখন 'অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে' বলা হয়, সংগীত তখন প্রকৃত অর্থেই নিবেদনের অর্ঘ্য হয়ে ওঠে। একইভাবে অসাধারণ কোনো চিত্রকলার সামনে এসে দর্শক যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেন। অবাক বিস্ময়ে কেবল চেয়ে থাকেন। অসাধারণ কোনো কবিতা পাঠ করে গুণমুগ্ধ পাঠক কবিতার ভাবরাজ্যে হারিয়ে যান। এভাবেই যুগ যুগ ধরে যেকোনো মহৎ শিল্পকর্ম মানুষকে মুগ্ধ করে। আবার অনুপ্রাণিতও করে।

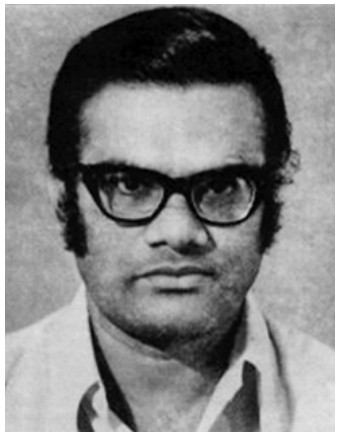
আলমগীর কবির

কখনো শিল্পের সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে আবার কখনো মুগ্ধ করে শ্রুতিকে। অর্থাৎ এমন কিছু দৃশ্য বা শব্দতরঙ্গে মুগ্ধ হতে হয়, যা সত্যিই অকল্পনীয়। তবে যেকোনো শিল্পের সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য প্রাথমিক কিছু ধারণা থাকা অপরিহার্য। অবশ্য অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমের তুলনায় চলচ্চিত্রের রসাস্বাদন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। চলচ্চিত্রের রস উপলব্ধির জন্য একটু বেশি এবং বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন। অনন্যসাধারণ মেধাবী চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির সব সময় তাঁর ছাত্রদের বলতেন, সিনেমা দেখার জন্য চোখ তৈরি করতে হয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রকৃতিদত্ত চোখ থাকলেই কেউ সিনেমা দেখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না। এ জন্য অবশ্যই আলাদা প্রস্তুতি প্রয়োজন। চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের বক্তব্য এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ :

চলচ্চিত্র হচ্ছে একটা অত্যন্ত জটিল মাধ্যম। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয়কলা সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল মাধ্যম। তাই একটি ছায়াছবির অন্তর্নিহিত রস গ্রহণ করতে হলে সে মাধ্যমটি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। চলচ্চিত্রের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সে ভাষাটা বোঝা এবং জানা দরকার। চলচ্চিত্রের নিজস্ব কতগুলো ভঙ্গি আছে, সেগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। নইলে চলচ্চিত্রের রস গ্রহণ সম্ভবপর নয়।

(*ক্যামেরা যখন রাইফেল*, জহির রায়হান, পৃষ্ঠা : ১০২)

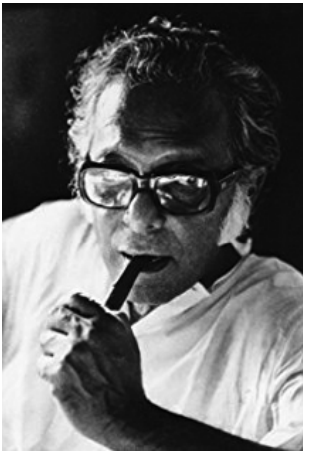

মৃনাল সেন

অন্য যেকোনো শিল্পের তুলনায় চলচ্চিত্র নিঃসন্দেহে একটি জটিল মাধ্যম। তাই চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের অবশ্যই এই মাধ্যমটি সম্পর্কে বিশেষ প্রস্তুতি এবং ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি চলচ্চিত্রের দর্শকদের বেলাতেও প্রযোজ্য। কৃতী চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন :

> ছবি করবার সময়েই আমি ধরে নিই যে দর্শকের সমস্যা থাকবেই। অর্থাৎ সব দর্শকের আমার ছবি ভালো লাগবে না। অনেকেই বাতিল করবেন, বাকিরা গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই বাতিল করতে বা গ্রহণ করতে, শিল্পসম্মত কায়দায় বাতিল করতে বা শিল্পসম্মত কায়দায় গ্রহণ করতে, আমার বিশেষ নির্বাচিত (ডিস্‌ক্রিমিনেটিং) দর্শক দরকার হবে এবং এই দর্শক ক্রমেই বাড়বে। তার প্রমাণ এখনই পাওয়া যায়।
>
> (*চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ*, মৃণাল সেন, পৃষ্ঠা : ৮)

চলচ্চিত্রের ভাষা পাঠ

চলচ্চিত্রের ভাষা মূলত ছবি ধ্বনি বা শব্দের সমন্বিত রূপ। এ জন্য চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিত্রনাট্যের ভাষা এমন হতে হবে, যা দেখা কিংবা উপলব্ধি করা সম্ভব। সাহিত্যের সাথে চিত্রনাট্যের এখানেই মৌলিক পার্থক্য। সাহিত্য যখন পাঠককে ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়, চিত্রনাট্য তখন সরাসরি সেই ভাবনাটি চোখের সামনে মেলে ধরে। ভাবনা তখন দৃশ্য হয়ে ওঠে। এভাবেই সাহিত্য থেকে বিশ্বখ্যাত অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা গ্রিফিথ নির্মাণ করেছিলেন তাঁর কালজয়ী ছবি *The Birth of a Nation* (১৯১৪)। অবশ্য তখন ছবিটির নাম ছিল *The*

Clansman। লেখক Dixon-এর অনুরোধে পরে ছবির নাম পাল্টানো হয়। পৌনে তিন ঘণ্টা ব্যাপ্তিকালের এই ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে ১ হাজার ৩৭৫টি শটে। অর্থাৎ ১ হাজার ৩৭৫টি চিত্রের সমন্বয়ে পুরো ছবিটি নির্মিত হয়েছে। এ যেন অজস্র ফুল দিয়ে একটি সম্পূর্ণ মালা গাঁথা। চলচ্চিত্রে প্রতিটি শট যেন একটি করে ফুল, কিন্তু ফুলগুলো ভিন্ন। কোনোটার সাথে কোনোটার মিল থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। তাই বিভিন্ন ফুলের সমাহারে যথার্থভাবে মালাটি গেঁথে তোলাই এখানে আসল কাজ। চলচ্চিত্রে এটাই চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রকার গ্রিফিথের এই ছবির চিত্রনাট্যের একটি অংশকে এভাবে দেখানো যেতে পারে :

শট ১ Full Shot লিংকনের দলবল। এক-এক করে তারা থিয়েটারের সর্বোচ্চ সিঁড়িতে ওঠেন এবং ঘুরে প্রেসিডেন্টের জন্য বিশেষ কক্ষে প্রবেশ করেন। লিংকনের দেহরক্ষীকে দেখা যায় সর্বাগ্রে এবং সর্বশেষে প্রেসিডেন্ট লিংকন স্বয়ং।

শট ২ থিয়েটারের অভ্যন্তর থেকে নেওয়া প্রেসিডেন্ট কক্ষ। প্রেসিডেন্টের সহযোগীরা কক্ষে প্রবেশ করেন।

শট ৩ Full Shot প্রেসিডেন্ট লিংকন কক্ষের বাইরে নিজের টুপি খুলে পরিচালকের হাতে দিলেন।

শট ৪ প্রেসিডেন্ট কক্ষ। কক্ষে লিংকন প্রবেশ করেন।

শট ৫ Mid Shot বেঞ্জামিন এবং এলসি অডিটরিয়ামে বসে আছেন। তাঁরা প্রেসিডেন্টের কক্ষের দিকে তাকান এবং উচ্ছ্বসিত হাততালি দিতে দিতে উঠে দাঁড়ান।

শট ৬ অডিটরিয়ামের দিক থেকে। প্রেসিডেন্ট কক্ষ ফ্রেমের ডান দিকে। দর্শকেরা Back to Camera-য় দাঁড়ানো অবস্থায় হাততালি দিয়ে লিংকনকে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন।

শট ৭ প্রেসিডেন্ট কক্ষ। লিংকন এবং মিসেস লিংকন সামনের দিকে নুয়ে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

শট ৮ শট ৬-এর অনুরূপ।

শট ৯ প্রেসিডেন্ট কক্ষ। অভিবাদন গ্রহণ শেষে লিংকন আসন গ্রহণ করেন।

(*চলচ্চিত্রের ভাষা*, বাদল রহমান, পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬)

এবার নিজের দেশের দিকে চোখ ফেরাই। কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্রকার মসিহউদ্দিন শাকের এবং শেখ নিয়ামত আলী নির্মাণ করেছেন

চলচ্চিত্র : *সূর্যদীঘল বাড়ী*, ১৯৭৯

সূর্যদীঘল বাড়ী (১৯৭৯)। সরকারি অনুদানে নির্মিত সাদাকালো এ ছবির দৈর্ঘ্য ১২ হাজার ৩৮৭ ফুট। নানাভাবে নন্দিত এ ছবির প্রথম দৃশ্যের চিত্রনাট্য সাজানো হয়েছে এভাবে :

Shot-1

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ Insert of a Card-এ তুলে ধরা হলো।

Shot-2

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্লেন উড়ছে এবং বোমাবর্ষণ করছে। নিচে ট্যাংক বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে।

Shot-3

গোডাউনে স্তূপীকৃত বস্তা। ব্যবসায়ীরা খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য অন্যায়ভাবে মজুত করে রেখেছে।

Shot-4

স্টিল : জয়নুল আবেদিনের পেইন্টিং।

ক. পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিখ্যাত স্কেচসহ আরও দুটি স্কেচ।

খ. স্থির আলোকচিত্র : অনশনক্লিষ্ট মা ও তার শিশু এবং আরও কয়েকটি দুর্ভিক্ষের স্থিরচিত্র।

Shot-5

একটি উড়ন্ত শকুন।

Shot-6

টাইটেল দৃশ্য।

Shot-7

চলচ্চিত্রকার ভিত্তোরিও দে সিকা

জয়গুন ফুটপাতের এক দেয়ালে ঘুঁটে তৈরির জন্য গোবর দিচ্ছে। সে কী যেন ভাবছে। বস্তির মন্বন্তরক্লিষ্ট নরনারীর সঙ্গে জয়গুনরা বাস করছে। হঠাৎ তার মনে ঢেঁকির শব্দ ভেসে আসে। অর্থাৎ গ্রাম তাকে ডাকছে। কারণ, পৌষ-মাঘ মাসের ধানের মৌসুম তাকে হাতছানি দেয়।

(মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী, *চলচ্চিত্রপত্র*, পৃষ্ঠা : ৬৯)

চলচ্চিত্র এমনই একটি শিল্পমাধ্যম, যেখানে রয়েছে দৃষ্টি আর শ্রুতির নিবিড় মেলবন্ধন। চলচ্চিত্রের সেই আদি যুগে, ফরাসি দেশে লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় (Louis Lumiere এবং Auguste Lumiere) থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির খোলা দরজা পেরিয়েও চলচ্চিত্রশিল্প মানুষকে মুগ্ধ করে চলেছে। এখনো কোনো কালজয়ী সিনেমার কথা মনে করে দর্শক সেই সিনেমার বিশেষ কোনো দৃশ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। এই যে মুগ্ধতা এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলা–তা একমাত্র সৃজনশীল শিল্পের জন্যই সম্ভব। চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে চলমান দৃশ্য দেখে মানুষ যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি খুশিও হয়েছে। একটি অভাবনীয় কাণ্ড মানুষ তখন নিজের চোখের সামনে সিনেমার রুপালি পর্দায় ঘটতে দেখেছে। এই দেখার মধ্যে কৌতূহলের পাশাপাশি অপার বিস্ময়ও ছিল। এরপর চলচ্চিত্রে আসে সবাক যুগ। পর্দায় চলমান মানুষের ছবিগুলো এবার সত্যি সত্যিই কথা বলে উঠল। এবং এর আরও পরে আসে রঙিন চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র এসে মানুষের চৈতন্যের প্রায় সবটাই যেন দখল করে নেয়। কারণ, চলচ্চিত্র এমনই সর্বগ্রাসী একটি মাধ্যম, যেখানে শিল্পকলার প্রতিটি শাখা উপস্থিত। অবশ্য নাটক, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রশিল্প সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর; যেন শিল্পের সকল রসাধার থেকে রস আহরণ করে এক পরিপূর্ণ মাধ্যম।

সাহিত্যের সাথে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়। কারণ, বিশ্বব্যাপী অসংখ্য মহৎ সাহিত্যকর্ম সিনেমার রুপালি পর্দায় চিত্রায়িত হয়েছে। ইতালির বিশিষ্ট লেখক লুইগি বার্তোলিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে রোম শহরে এক দরিদ্র পিতা ও তাঁর

চলচ্চিত্র : *দ্য বাইসাইকেল থিফ*, ১৯৪৮

পুত্রের চুরি হয়ে যাওয়া সাইকেল অনুসন্ধানের একটি মর্মস্পর্শী গল্প রচনা করেছিলেন। পরে সে দেশের অন্যতম চলচ্চিত্রকার ভিত্তোরিও দে সিকা গল্পটি অবলম্বনে নির্মাণ করেন কালজয়ী চলচ্চিত্র *The Bicycle Thief* (১৯৪৮)। যদিও ছবিটি ইতালির একজন সাহিত্যিকের গল্প অবলম্বনে নির্মিত, কিন্তু সেই চলচ্চিত্রের কৃতিত্ব অবশ্যই নির্মাতা ভিত্তোরিও দে সিকার। তবে এটাও ঠিক যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রায়োগিক ভাষা তৈরি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কৃতী নির্মাতা শেখ নিয়ামত আলীর একটি অভিমত বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে :

> প্রতি দশকে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রে জন্ম নিচ্ছে এমন সব প্রয়োগ ভাষা, যেগুলো বাস্তবিকই এ শিল্পকে দিন দিন জীবন্ত ও সৃজনশীল করে চলছে। কিন্তু এটাও সত্য, আজ যেটা উৎকৃষ্ট প্রয়োগ ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা গুরুত্ব পাচ্ছে– হয়তো, আগামী দশকে সে ভাষার প্রয়োগে ততটুকু উৎকর্ষ খুঁজে না পাবার জন্য তা কম গুরুত্বসহকারে ব্যবহৃত হতে পারে।
>
> (*প্রেক্ষাপট বিশ্ব চলচ্চিত্র*, শেখ নিয়ামত আলী, পৃষ্ঠা : ৮৮)

বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিরস্মরণীয় নাম। তাঁর দুটি কালজয়ী উপন্যাস *পথের পাঁচালী* ও *অপরাজিত* অবলম্বনে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় নির্মাণ করেন *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫), *অপরাজিত* (১৯৫৭) ও *অপুর সংসার* (১৯৫৯) নামে ত্রয়ী বা 'ট্রিলজি' চলচ্চিত্র। এককথায় এই ছবিগুলো অসাধারণ। বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম নিঃসন্দেহে অমূল্য সম্পদ। তাঁর সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলোও বাংলা চলচ্চিত্র ভান্ডারের অসাধারণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে চিরকাল। বিষয়টি

আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে প্রতিটি শিল্পমাধ্যমের প্রকাশ ভঙ্গি আলাদা। সাহিত্যে *পথের পাঁচালী*তে যেভাবে গল্প বর্ণনা করা হয়েছে, চলচ্চিত্রে সেভাবে বলা হয়নি। সেভাবে বলা যায়ও না। কারণ, সাহিত্যের ভাষা চলচ্চিত্রের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দুটি মাধ্যমও ভিন্ন। বিশ্লেষণের সুবিধার্থে দুটি মাধ্যমের প্রায়োগিক নমুনা হিসেবে একটি অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। উপন্যাসে দৃশ্যটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : দেশের স্টেশনে নামিয়া বৈকালের দিকে সে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হনহন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ির দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপনমনে বলিল– উঃ দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশঝাড়টা ঝুঁকে পড়েছে একেবারে পাঁচিলের উপর। ভুবনকাকা কাটাবেনও না– মুস্কিল হয়েছে আচ্ছা। –পরে সে বাড়ির উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল, ওমা দুগ্‌গা– ও অপু–

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। হরিহর হাসিয়া বলিল– বাড়ির সব ভাল? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ি নেই বুঝি?...

উপন্যাসের এই অংশটুকু বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য চিত্রনাট্যে সাজিয়েছিলেন এভাবে:

১.

'মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার পেছনের বাঁশবন।

Long Top Shot: দূর থেকে দেখা যায় হরিহর আসছে।

হরিহর: অপু!

২.

মেঘলা দিন। ইন্দিরের দাওয়া।

Close up: হরিহরের গলার স্বর শুনে সর্বজয়ার reaction-গালটা হাত থেকে সামান্য সরে গিয়ে শাঁখাটা আলগা হয়ে একটুখানি নিচের দিকে নেমে এল।

৩.

মেঘলা দিন। হরিহরের ভিটার দক্ষিণের পাঁচিলের পাশে।

Med Shot: হরিহর এসে থমকে দাঁড়ায়। একটা আমডাল ভেঙে পাঁচিলের ওপর পড়ে তার খানিকটা অংশ ভেঙে দিয়েছে।

হরিহর: (স্বগত) ইশ্, আর কটা দিন সবুর সইল না?

হরিহর ডালটা ডিঙিয়ে এগিয়ে আসে- Camera সঙ্গে সঙ্গে Pan করে।

হরিহর এগিয়ে এসে বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তার ভগ্ন কোঠারের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর উঠোনের দরজার দিকে ছবির গণ্ডির বাইরে চলে যায়। Camera

আর Pan করে না– ভাঙা পাঁচিলের পেছনে ভাঙা গোয়ালে গরুটা জাবর কাটছে। তার পেছনে হরিহরের দাওয়া। [নেপথ্যে হরিহরের দরজা খুলে ঢোকার শব্দ]।

কিছুক্ষণ পর হরিহরকে Long-এ দেখা গেল তার দাওয়ার সামনে পৌঁছেছে।

সে উদ্বিগ্নভাবে এদিক-ওদিক চায়।

হরিহরঃ (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) দুর্গা।

সর্বজয়া হরিহরের পাশ দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দাওয়ায় ওঠে।

হরিহরঃ ওঃ– তুমি আছ।

সর্বজয়াঃ এসো...

হরিহর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে।

(*বিষয় চলচ্চিত্র*, সত্যজিৎ রায়, পৃষ্ঠাঃ ৫০-৫১)

পথের পাচালি চলচ্চিত্রে হরিহর এসে থমকে দাঁড়ায়।
বলে, ইশ্, আর কটা দিন সবুর সইল না?

এই যে ভিন্ন দুটি মাধ্যম– সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, প্রকাশভঙ্গি আলাদা হলেও দুটি মাধ্যম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। প্রকাশরীতিতে কখনো একটি মাধ্যম অপরটিকে অতিক্রম করলেও করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো একটি বিশেষ মাধ্যমকে ছোট করে দেখা বা ভাবার উপায় নেই। তবে এ কথা ঠিক যে চলচ্চিত্রে সৃজনশীলতার বহুমাত্রিক সুযোগ রয়েছে, যা অন্য কোনো শিল্পের বেলায় সীমিত। এখানে একজন সৃজনশীল

নির্মাতা ইচ্ছে করলেই তাঁর বহুমাত্রিক ভাবনার ডানা অনায়াসেই মেলে ধরতে পারেন চলচ্চিত্রের পর্দায়। অর্থাৎ নির্মাতার ভাবনা এবং কল্পনাতে সৃষ্টির অপূর্ব সুযোগ রয়েছে সিনেমায়। দেশে-বিদেশে এভাবে অসংখ্য সাহিত্যকর্ম চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। কখনো সাহিত্যের তুলনায় চলচ্চিত্রটিকে ম্লান মনে হয়েছে, আবার কখনোবা চলচ্চিত্রের আলোয় নিষ্প্রভ মনে হয়েছে সাহিত্যকর্ম। তবে এটি বিচার্য বিষয় নয়। এ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা হতে পারে। কিন্তু তারপরও দুটি ভিন্ন মাধ্যম স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে অনবদ্য। চলচ্চিত্র তখনই সার্থক, যখন তা বোধগম্য হয়ে ওঠে। ছবিই এখানে ভাষা। চলচ্চিত্রে তাই এমন ছবি ব্যবহার করতে হবে, যা ফ্রেমের ছবি থেকে বোঝার ভাষা হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের শব্দ ও সংগীত

চলচ্চিত্রে ধ্বনি বা শব্দের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে ধ্বনি বা শব্দ চলচ্চিত্রে ইমেজ থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়। বরং তা ইমেজের পরিপূরক। ক্যানভাসে আঁকা পেইন্টিংয়ের কোনো ধ্বনি নেই। কিন্তু তারপরও একটি পেইন্টিং অনেক ধ্বনির সমাহার। একটি স্থিরচিত্র শব্দ করে কিছু প্রকাশ না করলেও অনেক কথাই বুঝিয়ে দেয়। তেমনি চলচ্চিত্রের প্রতিটি শট পেইন্টিংয়ের মতোই। এখানে অবশ্য ধ্বনি বা শব্দ ব্যবহারের সুযোগ আছে। কিন্তু তারপরও চলচ্চিত্রের একেকটি ছবি যেন একেকটি বাক্য। নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে দর্শক এভাবেই চলচ্চিত্র উপভোগ করেছেন। তবে সবাক চলচ্চিত্রের যুগে দর্শককে চোখ-কান দুটোই খোলা রাখতে হয়। কারণ, শুধু শব্দ বা ধ্বনি শুনে চলচ্চিত্রের বিষয় উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এখানে ইমেজটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় শব্দহীন ইমেজও চলচ্চিত্রে অনেক বড় ধ্বনি বা শব্দব্যঞ্জনা তৈরি করে, যা ধ্বনি বা শব্দ প্রয়োগে সম্ভব নয়।

এবার বাংলা সিনেমা এবং বাংলা সংগীতের কথা ভাবা যাক। বাংলা সিনেমা যেমন বাঙালির স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, তেমনি বাঙালির বাদ্যযন্ত্রেও আছে নিজস্বতা। পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্রের ভিড়ে আজও টিকে আছে বাংলার ঢোল, বাঁশি, খঞ্জনি, একতারা, দোতারা ইত্যাদি। অবশ্য বিদেশি যন্ত্র ব্যবহারেও বাঙালি সুরশিল্পীরা অনাগ্রহী নন। বাংলার সুপ্রাচীন যাত্রাশিল্পে ঢোল-বাঁশির পাশাপাশি বেহালা, ক্লারিওনেট, কর্নেট ইত্যাদি অনেক দিন আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বরেণ্য চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায় এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু পরিষ্কার কোনো ভাষা নেই। এখানে সাযুজ্যের একটা প্রশ্ন আসে। সব কথায় সুর বসে না। গান সেখানেই সার্থক যেখানে সুর হল ভাষার ব্যঞ্জক।... পথের পাঁচালি ছিল গ্রাম্য পরিবেশের কাহিনী। কিন্তু তা বলে তা লোকসাহিত্য নয়। তার ভাষায়, তার মেজাজে রীতিমত sophistication আছে। তার চরিত্রবর্ণনে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ আছে। ছবিতেও অনুরূপ sophistication আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল। সুতরাং এর আবহ সঙ্গীতে কেবল গ্রাম্য যন্ত্রে গ্রাম্য সুর

বাজানোর কোনো সার্থকতা আছে বলে আমরা মনে করিনি। বাঁশি, গুপিযন্ত্র, ঢোল ইত্যাদির সঙ্গে সেতার, সরোদ পাখোয়াজ মেশাতে তাই রবিশঙ্কর দ্বিধা করেননি।...

(*বিষয় চলচ্চিত্র*, সত্যজিৎ রায়, পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৬)

চলচ্চিত্রে সংগীত একটি আবশ্যিক মাধ্যম, এ জন্য চলচ্চিত্রের কথা বলতে গিয়ে বারবার সংগীতের কথা এসে যায়। তবে সংগীত কেবলই সুরসমৃদ্ধ বাণীনির্ভর কোনো গান নয়। যেকোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও সংগীতের অংশ। তাই বাণীনির্ভর গান ছাড়াও চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে কিন্তু সবাক চলচ্চিত্র যুগে সংগীতবিহীন চলচ্চিত্রের কথা ভাবা অসম্ভব। যদি বলি, সংগীত কেন অপরিহার্য, এককথায় এ রকম উত্তর হতে পারে যে সংগীত পরিবেশবান্ধব। প্রকৃতি ও পরিবেশের সবকিছুই ছন্দোবদ্ধ। প্রকৃতির সর্বত্র একটা নির্দিষ্ট রীতি বা ধারার অনুসরণ রয়েছে। এখানে বিশৃঙ্খলার স্থান নেই। তাই বিশৃঙ্খলায় বিপর্যস্ত মানুষকে বারবার প্রকৃতির কাছেই ফিরে যেতে বলা হয়। প্রকৃতি শান্তি ও স্বস্তির আধার। যেখানে শৃঙ্খলা, সেখানেই শান্তি। যেহেতু প্রকৃতির সর্বত্র শৃঙ্খলা বিরাজমান, তাই একমাত্র প্রকৃতিতেই শান্তি। শুচিস্নিগ্ধ প্রকৃতিই বিশ্ব চরাচরকে শান্তির পাঠে উজ্জীবিত করতে পারে। ফারসি প্রবাদে বলা হয়, 'তলোয়ার দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু সংগীত দিয়ে শত্রুকে বন্ধু করা যায়'। পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রবোদ্ধারাও চলচ্চিত্রে সংগীতের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন: Music in film can never be ignored discounted, even when the audience is not consciously aware of it, and even when the music is so low as to seem almost inaudible. Not only is music among the most effective of film making tools, it is among the most flexible, at least when used to create and direct emotions and psychic states of being. Its appeal is non-rational so far as the film audience is concerned...

(*The work of the Film Director*, A. J. Reynertson, Page: 68)

ছবির ভাষা ছবিতে

ফটোগ্রাফি বা চিত্রায়ণ চলচ্চিত্রের মুখ্য ভাষা। অসংখ্য ছবির মেলবন্ধনেই চলচ্চিত্রের ভাষা মূর্ত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের নামটি এখানে খুবই প্রাসঙ্গিকভাবে এসে যায়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত তাঁর অসাধারণ প্রামাণ্যচিত্র *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১)। 'গণহত্যা বন্ধ করো' এই শিরোনাম তুলে ধরে যে ফটোগ্রাফি বা চিত্রায়ণে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে, তা এককথায় অসাধারণ। এক দেশের মানুষের মুখের ভাষা অন্য দেশের মানুষের কাছে বোধগম্য না হলেও ছবির অসাধারণ ভাষায় সর্বগ্রাহী দৃশ্যপট নির্মাণ করা হয়েছে এই ছবিতে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত এই ছবিটি এখন পর্যন্ত দেশের প্রামাণ্যচিত্রের ক্ষেত্রে এক অনন্য মাইলফলক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং

চলচ্চিত্র : *স্টপ জেনোসাইড*, ১৯৭১

স্বাধীনতাসংগ্রামকে আশ্রয় করে জহির রায়হান আরও কয়েকটি ছবি নির্মাণ করেছেন : *বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার* (১৯৭১), *আ স্টেট ইজ বর্ন* (১৯৭১), *লিবারেশন ফাইটার্স* (১৯৭১) এবং *ইননোসেন্ট মিলিয়নস* (১৯৭১)। অবশ্য স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে তাঁর নির্মিত কাহিনিচিত্র *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতাসংগ্রামে যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চলচ্চিত্রায়ণ যে ছবির আসল ভাষা, সে কথার সার্থক প্রমাণ মেলে জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭১) ছবিতে। যদিও ছবিটি প্রতীকধর্মী কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ছবির ফটোগ্রাফি এবং ফ্রেমিং অনেক কথা বলে দেয়, যা সংলাপে বলার প্রয়োজন হয়নি। ছোট্ট একটি উদাহরণ হিসেবে ছবিতে সমবেত কণ্ঠে 'কারার ঐ লৌহকপাট' গানের দৃশ্যটির কথা বলা যেতে পারে। অভিনয়ে প্রতিটি চরিত্রের শাণিত অভিব্যক্তির পাশাপাশি শটগুলোর ফ্রেম কম্পোজিশন দেখলেই বোঝা যায়, কী অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ইমেজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে অসংখ্য লাঙল। এরই ফাঁকে ফাঁকে খুব ক্লোজ শট ধরা হয়েছে চরিত্রগুলোর। গানটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হলেও চরিত্রগুলোর ক্লোজ শটে তাদের প্রতিবাদী ইমেজ তুলে ধরে যে বার্তা নির্মাতা দিতে চেয়েছেন, তা খুবই প্রাসঙ্গিক। একই ছবিতে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি চিত্রায়িত করা হয়েছে। দুটি গান সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি আঙ্গিকের। চিত্রায়ণও করা হয়েছে সেভাবে। শটগুলো এমনভাবে কম্পোজ করা হয়েছে, যেখানে অভিনেতা অথবা অভিনেত্রীকে ক্লোজ ভিউতে রেখে গ্রামবাংলার পরিবেশকে দেখানো হয়েছে বড় পরিসরে। চমৎকার শট ডিভিশন গানের আবেদন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের এই অসাধারণ মেধাবী নির্মাতা সাহিত্যচর্চা এবং পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *সূর্যগ্রহণ*, *শেষ বিকেলের মেয়ে*, *হাজার বছর ধরে*, *আরেক ফাগুন*, *বরফ গলা নদী*, *আর কতো দিন*, *কয়েকটি মৃত্যু*, *তৃষ্ণা*। চলচ্চিত্র পরিচালনার পাশাপাশি প্রযোজনাও করেছেন বেশ কিছু সাড়াজাগানো ছবি *জ্বলতে সূরুজ কি নিচে* (১৯৭১), *জুলেখা* (১৯৬৮), *সংসার* (১৯৬৮), *সুয়োরানী দুয়োরানী* (১৯৬৮), *দুইভাই* (১৯৬৮), *শেষপর্যন্ত* (১৯৬৯), *মনের মত বউ* (১৯৬৯)। অনেক আশা নিয়ে শুরু করেছিলেন নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র *লেট দেয়ার বি লাইট* (১৯৭০) নির্মাণের কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, নানা প্রতিকূলতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে সে ছবি আর কোনো দিনই আলোর মুখ দেখেনি।

ছবির ভাষা যে ছবি, সে জন্য অতিরিক্ত শব্দ বা সংলাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, এ কথার প্রমাণ অনেক ছবিতেই মেলে। স্মরণ করা যেতে পারে কালজয়ী নির্মাতা ঋত্বিককুমার ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩) ছবির কথা। অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসকে কেন্দ্র করে ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশের তিতাস নদীপাড়ের অবহেলিত জেলেদের সুখ-দুঃখ নিয়েই এই ছবি। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে নিজেই বলেছেন: তিতাস একটি নদীর নাম। তার কূলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস। স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে ঘুম পাড়াইতে বসে, কিন্তু পারে না।... তিতাস শাহী মেজাজে চলে। তার সাপের মতো বক্রতা নাই, কৃপণের মতো কুটিলতা নাই।

চলচ্চিত্র : *জীবন থেকে নেয়া*, ১৯৭১

চলচ্চিত্র : *তিতাস একটি নদীর নাম*, ১৯৭৩

কৃষ্ণপক্ষের ভাটায় তার বুকের খানিকটা শুষিয়া নেয়, কিন্তু কাঙ্গাল করে না। শুক্লপক্ষের জোয়ারের উদ্দীপনা তাকে ফোলায়, কিন্তু উদ্বেল করে না।
(*তিতাস একটি নদীর নাম*, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, পৃষ্ঠা: ৩)

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক যে খুবই বিশ্বস্ততার সাথে উপন্যাসটির চিত্রায়ণ করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ছবিতে এমন অনেক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা সরাসরি উপন্যাসে নেই, কিন্তু তার ইঙ্গিত রয়েছে। চলচ্চিত্রকার সেই ইঙ্গিতকে যথাযথভাবে সিনেমার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃশ্যপট তৈরি করতে কখনো কার্পণ্য করেননি তিনি। এ ছবির সাদাকালো ফটোগ্রাফিই যেন ছবির ভাষা। অনেক না বলা কথা কেবল চিত্রায়ণের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে এই ছবিতে।

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটক কথাসাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাসের প্রেক্ষাপট এভাবে বর্ণনা করেছেন: তিতাস পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) এ রকম লেখার দেখা পাওয়া যায়

চলচ্চিত্রকার
ঋত্বিক কুমার ঘটক

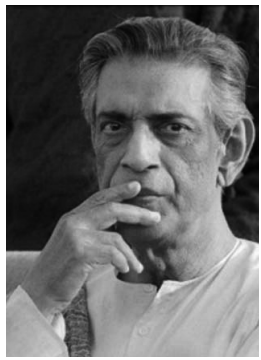

চলচ্চিত্রকার
সত্যজিৎ রায়

চলচ্চিত্র : *তিতাস একটি নদীর নাম*, ১৯৭৩

না। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো– সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। ব্যাপারটা ছবিতে ধরা পড়ার জন্য জন্ম থেকেই কাঁদছিল।... অদ্বৈতবাবু অনেক অতিকথন করেন। কিন্তু লেখাটা একেবারে প্রাণ থেকে, ভেতর থেকে লেখা। আমি নিজেও বাবুর চোখ দিয়ে না দেখে ওইভাবে ভেতর থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। অদ্বৈতবাবু যে সময়ে তিতাস নদী দেখেছেন, তখন তিতাস ও তার তীরবর্তী গ্রামীণ সভ্যতা মরতে বসেছে। বইয়ে তিতাস একটি নদীর নাম। তিনি এর পরের পুনর্জীবনটা দেখতে যাননি। আমি দেখাতে চাই যে, মৃত্যুর পরেও এই পুনর্জীবন হচ্ছে। তিতাস এখন আবার যৌবনবতী। আমার ছবিতে গ্রাম নায়ক, তিতাস নায়িকা।

(তিতাস একটি নদীর নাম, ছুটির দিনে, দৈনিক *প্রথম আলো*, ৭ জানুয়ারি ২০১২)

১৫৯ মিনিটের এই ছবিতে খুব কমই সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ছবি যে সিনেমার আসল ভাষা, এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষাকে অবিক্রিত রেখে সংলাপ প্রয়োগ ছাড়াও ছবিজুড়ে যে ধরনের দৃশ্যকল্প তৈরি করা হয়েছে, তা কেবল ঋত্বিককুমার ঘটকের পক্ষেই সম্ভব।

চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিচার

আমরা চলচ্চিত্রের নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে সাধারণ সৌন্দর্যের কথা বলেছি। নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা অনেক বড় পরিসরের। চলচ্চিত্রবোদ্ধারাই সে আলোচনার প্রকৃত সমঝদার। কিন্তু আমরা সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে চলচ্চিত্রের

বহিরাবরণ বা সৌন্দর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি মাত্র। যেকোনো শিল্পমাধ্যমেরই বহিরাবরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুন্দর প্রচ্ছদপট, মনোরম বাঁধাই আর ঝকঝকে মুদ্রণের একটি বই স্বাভাবিকভাবে একজন পাঠককে আকৃষ্ট করে। তেমনি একটি সুন্দর পরিপাটি চিত্রের ক্যানভাস দর্শককে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে থাকে। সংগীতের বেলাতেও একই কথা। চমৎকার সুরমূর্ছনা শুরুতেই শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। তাহলে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিচার কিসের নিরিখে করা হবে? চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিচারের মানদণ্ডই বা কী?

চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যের কথা বলতে গেলে এভাবে বলা যায় যে একজন নির্মাতার দৃষ্টিভঙ্গিই শেষ কথা। একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার চেষ্টাই একটি চলচ্চিত্রকে সুন্দর করতে পারে। এখানে অবশ্যই চলচ্চিত্রকারের মেধা, মননশীলতা ও রুচিবোধ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন কবি তাঁর কথা আর ছন্দকে পাঠকের জন্য শ্রুতিনন্দন ও পাঠযোগ্য করে তোলেন। একজন শিল্পী রেখা ও রঙের বিন্যাসে ক্যানভাসে দৃষ্টিনন্দন করে তোলেন তাঁর শিল্পকর্ম। কিন্তু একজন চলচ্চিত্রকারের দায়িত্ব দর্শকের দৃষ্টি ও শ্রুতিকে একত্রে আকৃষ্ট করা।

চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব বিষয়টি বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে তাই এখনো নানা যুক্তি ও তর্কের অবকাশ রয়ে গেছে। অন্যান্য শিল্প আঙ্গিকের নান্দনিকতার ধরন অন্বেষণের ক্ষেত্রে যেসব প্রশ্ন ও বিবেচনার মুখোমুখি হতে হয়, চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব অন্বেষকদেরও সেসব প্রশ্ন ও বিবেচনার মুখোমুখি হতে হয়। তবে এ কথা ঠিক যে সিনেমার ভাষা তার ইমেজে। ভালো সিনেমা অযথা কথার পিঠে কথা বা সংলাপ বলে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় না। অপ্রয়োজনীয় শব্দ আর কথোপকথন ভালো সিনেমার জন্য কোনো সহায়ক উপকরণ নয়। বরং ছবির ইমেজ নানাভাবে শব্দের ইঙ্গিত দেয়। ইমেজই বুঝিয়ে দেয় সে কী বলতে চায়। তাই ছবিতে অপ্রয়োজনীয় শব্দের চেয়ে ইমেজ অনেক বেশি কার্যকর। একটি সংলাপ যা বোঝাতে পারে, ইমেজ তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝায়। আর তাই ইমেজকে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: চিত্রপরিচালকের হাতে তথ্য পরিবেশনের যত রকম উপায় আছে তার মধ্যে দুর্বলতম হচ্ছে কথা। দৃশ্য বা ধ্বনির সাহায্যে কাজ না হলেই চিত্রনাট্যকার তথা পরিচালক কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অন্তত সার্থক চলচ্চিত্রের এই নিয়ম। চীনাদের সেই উক্তি– 'এক ছবি হাজার কথার সামিল'– চলচ্চিত্রকারকে তাই মনে রাখতে হয়। শক্তিমান পরিচালকের প্রধান গুণ হল বাক্যের সাহায্য না নিয়েও দৃশ্যকে বাঙ্ময় করে তোলা। একাজে ক্যামেরা অভিনয় দৃশ্যগত ডিটেল সম্পাদনা ইত্যাদি সবকিছুই প্রয়োজনে আসতে পারে। (*বিষয় চলচ্চিত্র*, সত্যজিৎ রায়, পৃষ্ঠা: ১১৫-১১৬)

চলচ্চিত্রে ফটোগ্রাফি বা সিনেমাটোগ্রাফি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য অনেকাংশে নির্ভর করে তার চিত্রায়ণে। সত্যজিৎ রায়ের সাদাকালো *পথের পাঁচালী* (১৯৫৫) ছবিতে কাশবনের মধ্য দিয়ে দুই কিশোর-কিশোরী অপু ও দুর্গার ট্রেন দেখার জন্য ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটির কথা ভাবা যেতে পারে। সাদা কাশবন আর ট্রেনের কয়লার ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় মিলেমিশে অপরূপ এক দৃশ্যপট। এভাবেই সুন্দর দৃশ্য সংযোজনার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিবেচিত হতে পারে। চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্যের শট এবং ফ্রেমগুলো সুন্দর হলেই সেই দৃশ্যটি সুন্দর হয়। তবে এ কথাও ঠিক যে কেবল ভালো চিত্রায়ণ হলেই একটি চলচ্চিত্র সৌন্দর্যমণ্ডিত ছবি হয় না, সেখানে কোন বিষয়টি কীভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, সেটিই আসল। এখানে দৃশ্যকল্প নির্মাণশৈলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

চলচ্চিত্র *পথের পাঁচালী*তে (১৯৫৫) অপু ও দুর্গা ট্রেন দেখার জন্য কাশবনের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

সত্যজিৎ রায় অবশ্য ক্যামেরার পাশাপাশি অভিনয়, দৃশ্যগত ডিটেল, সম্পাদনা ইত্যাদির কথাও বলেছেন। অভিনয় অবশ্যই চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। অভিনয়ের সাথে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য অনেকাংশেই নির্ভরশীল। ধরা যাক রাজেন তরফদারের *পালঙ্ক* (১৯৭৬) ছবিটির কথা। কী অসাধারণ অভিনয়শিল্পী উৎপল দত্ত এবং আনোয়ার হোসেনের। একজন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের প্রতিভূ, আর একজন অতি

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। শিল্পী আনোয়ার হোসেনের কাছে শুনেছি, কলকাতায় এই ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় দর্শক ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শিল্পী আনোয়ার হোসেন তাঁর পাশাপাশি বসেই ছবিটি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। ছবি দেখার পর সত্যজিৎ রায় আনোয়ার হোসেনকে তাঁর অনবদ্য ও সাবলীল অভিনয়ের জন্য প্রশংসাও করেছিলেন। চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির সিনেমা সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, Film is nothing but a make belief game, অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্যতার যত বেশি কাছাকাছি যাওয়া যাবে, ততই সেটি সফল চলচ্চিত্র হবে। তাই অভিনয় যে চলচ্চিত্রের সৌন্দর্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিনেমার দৃশ্যগত ডিটেল, সম্পাদনা ইত্যাদি। চলচ্চিত্রপ্রিয় দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, *পথের পাঁচালী*র সেই ঝড়-জলের পর অপু-দুর্গাদের বাড়ির ভাঙাচোরা রান্নাঘরটির কথা। দৃশ্যগত ডিটেল নির্মাণ করতে গিয়ে সেখানে একটি মরা ব্যাঙের উপস্থিতি যে কত জরুরি হতে পারে, সেটা না দেখলে বোঝা সম্ভব নয়। এখানেও ওই বিশ্বাসযোগ্যতার কথা ঘুরেফিরে আসে। আবার সম্পাদনার টেবিলে ভিন্ন ভিন্ন শট জোড়া দিয়ে যখন দৃশ্য নির্মাণ করা হয়, তখনো 'make belief game'-এর কথাটাই মাথায় থাকে।

শেষ কথা

বিশ্ব চলচ্চিত্রের অনেক পালাবদল ঘটেছে, এখনো ঘটছে। একইভাবে পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে। এ দেশের চলচ্চিত্রেও নানা ধরনের নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। ছক বাঁধা সিনেমার বাইরে দেশের আর্থসামাজিক, এমনকি মানবিক বিভিন্ন বিষয় এখন আমাদের সিনেমায় উঠে আসছে। এ জন্যই বোধ হয় বিশ্ব চলচ্চিত্র আসরে বাংলাদেশের বেশ কিছু ছবি ইতিমধ্যে পুরস্কৃত এবং সম্মানিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের তরুণ সম্প্রদায় চলচ্চিত্র নিয়ে এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন একসময় তরুণদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। ঠিক তেমনিভাবে স্বাধীনতার চার দশক পর নতুন চলচ্চিত্র নির্মাণে তরুণেরা অনেক বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র এখন অধ্যয়নের বিষয়। এ সবই আশার কথা। একসময় সিনেমা ছিল বিনোদনের মাধ্যম। কিন্তু সেই বিনোদনের পরিচিত গণ্ডি পেরিয়ে সিনেমা এখন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি লাভ করেছে। সিনেমার ভাষা এবং সৌন্দর্য বিচার এখন কেবল শিল্পীর অভিনয়ে সীমিত নয়, বরং সবকিছুর মেলবন্ধনেই তৈরি হয় একটি চলচ্চিত্র। তাই চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য বিচারে এর প্রতিটি উপাদানই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে চলচ্চিত্র দেখা ও শোনার একটি যুগল মাধ্যম। দেখার জন্য ইমেজের সৌন্দর্যের পাশাপাশি শোনার জন্য শব্দ ও সুরমূর্ছনার সৌন্দর্যও বেশি জরুরি। চলচ্চিত্রের ধ্বনি বা শব্দটি দর্শক-শ্রোতা কীভাবে গ্রহণ করবেন, সেটিও ভাববার বিষয়। শব্দের মধ্যে সংলাপ, স্বাভাবিক স্বর ও সুর-ব্যঞ্জনা কোনোটির গুরুত্বই কম নয়। শ্রুতি যখন শ্রোতা ও দর্শকের কর্ণকুহরে বিরক্তি উৎপাদন না করে বরং আনন্দ জাগায়, শ্রোতা তখনই বোধ হয় আপনমনে বলে ওঠেন:

'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি'...

অবশ্যই চলচ্চিত্র অবাক হয়ে দেখা এবং শোনার মাধ্যম। অবাক এই অর্থে যে দর্শক তার কল্পনাকে সিনেমার পর্দার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবনার সুযোগ খুঁজে পান। সিনেমা শুধু দেখার বিষয় নয়, উপভোগ এবং সেইসাথে ভাবনাচিন্তারও বিষয় বটে।

লেখক পরিচিতি : **শ্যামল দত্ত,** চলচ্চিত্র সাংবাদিক, চিত্রনাট্যকার।

তথ্যসূত্র

রহমান, বাদল (১৯৮৫) *চলচ্চিত্রের ভাষা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

খসরু, মুহম্মদ (সম্পাদনা)। *ক্যামেরা যখন রাইফেল*, ঢাকা, ফিল্ম বুলেটিনের বিশেষ সংকলন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ, ১৯৮০। পৃ. ১০২

খসরু, মুহম্মদ (সম্পাদনা)। *চলচ্চিত্রপত্র*, ঢাকা, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ, ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৯৮১। পৃ. ৬৯

রায়, সত্যজিৎ (১৯৮২) *বিষয় চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

জামিল মাহবুব (সম্পাদনা)। *প্রেক্ষাপট: বিশ্ব চলচ্চিত্র*, ঢাকা, অনুষ্টুপ চলচ্চিত্র সংসদ, দ্বিতীয় পর্যায়, ১৯৭৬। পৃ. ৮৮

সেন, মৃণাল (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ) *চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ*, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা

রহমান, মতিউর (সম্পাদনা) *ছুটির দিনে*, দৈনিক *প্রথম আলো*, ৭ জানুয়ারি ২০১২

Reynertson A. J. *The Work of the Film Director*, London, Focal Press 3rd ed 1978, p 68

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে বিনোদন পাতার আধেয় তথ্য-উপযোগিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ

আবুল মনসুর আহাম্মদ
রফিকুজজামান

ভূমিকা

গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের মূল কাজ হলো উপযুক্ত ও দরকারি তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করে গণমানুষের স্বার্থ রক্ষা করা। গণমানুষের স্বার্থকে পাহারা দিতে হয় বলেই গণমাধ্যমকে বলা হয় ওয়াচডগ বা প্রহরী। গণমাধ্যম কখনো কখনো গণমানুষের স্বার্থ রক্ষায় যথার্থ ভূমিকা প্রতিপালনে ব্যর্থ কি না, সেটি বর্তমান সময়ের গণমাধ্যম আলোচনায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ একটি ডিসকোর্স। জনগণের কথা না বলে বিশেষ শ্রেণি/গোষ্ঠীর কথা বলার কারণে গণমাধ্যমকে 'শ্রেণিমাধ্যম' (ফেরদৌস ও সালাম: ২০০৯, পৃ. ১৮) বলেও একধরনের প্রপঞ্চ দাঁড় করিয়েছেন যোগাযোগ তাত্ত্বিকগণ। একটি পত্রিকার অনেকগুলো পাতা থাকলে কিংবা রাশি রাশি খবর থাকলেই সেটি ভালো গণমাধ্যম হয়ে যায় না। এটি খুবই বিবেচ্য বিষয় যে সেই

পাতাগুলোতে কী ধরনের খবর প্রকাশিত হয়। বিশেষ করে বর্তমান আধুনিক বিশ্বে তথ্যের অবাধ প্রবাহধারায় শুধু তথ্যই সব নয়; তথ্যের উপযোগিতা, তার গ্রহণযোগ্যতা, সর্বোপরি 'আমার জন্য এই তথ্য দরকার কি না'–এই বিবেচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি পত্রিকা তার সমস্ত পাতাজুড়ে কী কী খবর পরিবেশন করবে, সেটি অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বেশি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। সেটি করার আগে অপরিহার্য হলো খবরের 'স্থানীয়' ডেফিনিশন তৈরি করা। কোনটি খবর, সেটি জানা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কোনটি খবর নয়, তা-ও জানতে হবে। পশ্চিমা বিশ্বের খবরের সংজ্ঞায়নের মধ্যেই রয়েছে পুঁজিবাদী তথা ভোগবাদী জীবনের স্বার্থপর বয়ান। তাদের দৃষ্টিতে 'যা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই সংবাদ নয়, যা আগ্রহোদ্দীপক, তা-ই সংবাদ'। সংবাদসম্পর্কিত এই ধারণা পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোর সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায় (হক: ১৯৮৫, পৃ.৭২)। 'আগ্রহোদ্দীপক' শব্দটি প্রকারান্তরে তাদেরই ইচ্ছায় এবং স্বার্থে নির্মিত। তারা যেভাবে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে জীবন ও জগৎকে দেখছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও যেন সেভাবেই জগৎকে দেখে ও মূল্যায়ন করে, এই উপনিবেশবাদী চেতনা দিয়েই তারা খবরকে সংজ্ঞায়িত করে। পশ্চিমারা খবরের যে ডেফিনিশন দিয়েছে, তা তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের জন্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। বিবিসি/সিএনএনের কোনো খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যমের খবর হবেই, তথ্যের উপযোগিতাবোধ বিবেচনায় এমন ধারণা যৌক্তিক নয়। কোনটি খবর আর কোনটি খবর নয়, অর্থাৎ খবর নির্ধারণের মানদণ্ড সব দেশে সমান নয় (হোহেনবার্গ: ১৯৭৩, পৃ. ৪৪)। খবরের মনোগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন আছে। একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর মূল্যবোধের মিশেলে সেই দর্শন নির্মাণ করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সারা বিশ্বে তথ্য সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক হয়ে থাকে, দক্ষিণ এশিয়ায় সেই ভূমিকা পালন করছে ভারত। বিশেষ করে, এ অঞ্চলের বিনোদনজগৎ ভীষণভাবে ভারত-নিয়ন্ত্রিত। ভারতের টেলিভিশন চ্যানেল এবং সংবাদ সংস্থার মাধ্যমেই সেখানকার বিনোদনের অধিকাংশ খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো পেয়ে থাকে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো পাঠকের 'আগ্রহ' রয়েছে মনে করে কোনো রকমের বিবেচনা ছাড়াই সেগুলো খবর হিসেবে প্রকাশ করে। মাঝেমধ্যে জনসম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করে হালকা মূল্যের খবরের ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। মূলধারার গণমাধ্যম প্রায়ই এমন সস্তা বিষয়ে খবর করে, যেখানে কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই করা হয় না। এটি করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তার প্রচারসংখ্যা বাড়ানো, যাতে আরও বেশি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। এর মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে রসাল একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করা গেলেও যথার্থ সাংবাদিকতার চর্চা আড়ালে পড়ে যায় (হাসান: ২০১০, পৃ. ১৮৮)। নিজস্ব বাজার বাড়ানোর এই

উদ্যোগের কাছে হেরে যায় সংবাদের মৌলিক গুণবিচার। সংবাদপত্র এখন বাজার অর্থনীতির বড় নিয়ন্ত্রক। গণমাধ্যমের ব্যবসায়িক বিস্ফোরণ ভৌত-অভৌত সবকিছুকে ব্যবসায়িক চোখ দিয়ে দেখতে শেখায়। গণমাধ্যম সংবাদ, বিনোদন ও অন্য কার্যাবলিকে ট্যাবলয়েড ও চাঞ্চল্যকরভাবে তৈরি করে মুনাফা জোগানোর অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত করে। যেটা জনগণের জ্ঞানস্তর এবং গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ (আহমেদ, ফেরদৌস ও ইসলাম: ২০০৯, পৃ. ৪৮-৪৯)। বাংলাদেশের গণমাধ্যম, বিশেষ করে সংবাদপত্র বিনোদন পাতায় যেসব খবর প্রকাশ করে, তার মধ্যে এমন কিছু খবর রয়েছে, যা তথ্য-উপযোগিতার বিচারে অপ্রয়োজনীয়। পাঠকের জ্ঞানস্তর বৃদ্ধিতে এ খবরগুলো কোনো ভূমিকা রাখে না। অপরাপর নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করে কিংবা কম গুরুত্ব দিয়ে বিনোদনশিল্পী কিংবা সেলিব্রেটিদের ওপর মূলধারার গণমাধ্যম বেশি মনোযোগী হলে তা সাংবাদিকতার জন্য ক্ষতিকর ও জনস্বার্থ-পরিপন্থী। এটিকে আজকের দিনের সাংবাদিকতার একটি বড় সমালোচনা বলে মনে করা হয় (উইলিস: ২০১০, পৃ. ১০৯)।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রথম সারির কয়েকটি সংবাদপত্রের বিনোদন পাতার বাছাই করা কিছু খবরের পর্যালোচনা করা হয়েছে। মোটাদাগে এর উদ্দেশ্য হলো প্রকাশিত খবরগুলোর তথ্য-উপযোগিতা যাচাই করা। অর্থাৎ বিনোদন পাতার বাছাই করা খবরগুলো বা খবরের তথ্যগুলো পাঠকের জন্য কতটুকু উপকারী বা উপযোগী, তা বিশ্লেষণ করা। প্রাসঙ্গিকভাবে খবরের সঙ্গে সংযুক্ত কিছু ছবি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও ধরন বিবেচনা করাও এর উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি

উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাছাইকৃত নমুনায়ন পদ্ধতি অনসুরণ করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম সারির কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রের বিনোদন পাতায় প্রকাশিত বেশ কিছুদিনের খবর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেখান থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিছু খবর বেছে নিয়ে তথ্য-উপযোগিতার প্রায়োগিক মানদণ্ডের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। খবর বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সময়ের ধারাবাহিকতা অনুসরণ না করে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত খবর, যেগুলো এই গবেষণা-উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, এমন খবরকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিছু খবরের সঙ্গে এঁটে দেওয়া ছবির প্রাসঙ্গিকতা ও উপস্থাপনার ধরন নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় যেসব সংবাদপত্রের খবর বাছাই করা হয়েছে সেগুলো হলো: *প্রথম আলো*, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, *ইত্তেফাক*, *মানবজমিন*, *যুগান্তর* ও *সমকাল*।

খবরের তথ্য-উপযোগিতা

সাংবাদিকতার ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও সংবাদ বা খবর কী, এ বিষয়ে একক এবং সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বস্তুত সেটি সম্ভবও নয়। খবর কী, এটি বুঝতে পারা গেলেও একে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। একজনের কাছে যা খবর, অন্যজনের কাছে তা খবর না-ও হতে পারে (ওয়ারেন: ১৯৫৯, পৃ. ১৩)। খবরের যতগুলো সংজ্ঞা এযাবৎ দেওয়া হয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে, তার কোনোটিকেই পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে না। যেমন বলা হয়, খবর তা-ই যা অধিকাংশ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে কিংবা অধিকাংশ মানুষ যা জানতে আগ্রহী হয় (হ্যারিস, লেইটার অ্যান্ড জনসন: ১৯৮১, পৃ. ২৬)। প্রশ্ন হলো, অধিকাংশ মানুষের এই আগ্রহ কীভাবে তৈরি হয় কিংবা একজন সাংবাদিক অধিকাংশ মানুষের আগ্রহের ব্যাপারটি কীভাবে বুঝতে পারেন। পাঠকের আগ্রহ আছে বলেই সাংবাদিক কোনো ঘটনাকে খবর করেন, নাকি খবর করা হয় বলেই সে বিষয়ে পাঠকের আগ্রহ তৈরি হয়? খবরের পেছনের এই মৌলিক দর্শনকে উপেক্ষা করে খবর কী বা খবর কী হওয়া উচিত, সেসবের সুরাহা হবে না। সংবাদপত্রে কোনো একটি খবরের সঙ্গে একজন নারীর বেশ খোলামেলা একটি ছবি সংযুক্ত করা হলো। সেই খবরটি যথারীতি সর্বাধিক পঠিত খবরের তালিকায় প্রথম অবস্থানে থাকল। এমন একটি 'আপত্তিকর' ছবি দেওয়া হলো কেন, এ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পত্রিকার সম্পাদক। সম্পাদকের জবাব হলো, পাঠকের চাহিদা ছিল বলেই আমরা ছবিসহ খবরটি ছেপেছি, যার প্রমাণ এটি সর্বাধিক পঠিত খবর হয়েছে। সম্পাদকের এই যুক্তি খণ্ডনযোগ্য। পাঠকের আগ্রহ ছিল বলেই এটি দেওয়া হয়নি; বরং দেওয়া হয়েছে বলেই পাঠকের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। পাঠক নিশ্চয়ই হালকা খবর আর খোলামেলা ছবি দেখার জন্যই দৈনিক পত্রিকা পড়ে না। এমন মানসিকতার পাঠক যদি থেকেও থাকে, তাদের এ ধরনের খবর দিয়ে দিয়ে পত্রিকাই তৈরি করেছে। ফরাসি দার্শনিক ও সাংবাদিক আলবার্ট ক্যামাস এ প্রসঙ্গেই বলেছেন, 'We are told that this is what the public want. No. This is not what the public want. This is what the public has been taught to want.' পাঠক কী পড়বে বা কী পড়বে না, তা বাছাই করার পুরো সক্ষমতা পাঠকের হাতে নেই। পাঠককে তা-ই পড়তে হয় যা সংবাদপত্র ছাপে। এর মধ্য দিয়ে তাকে চাইতে শেখানো হয়। একধরনের কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করা হয়, যা 'পাঠকের চাহিদা' বলেই পরবর্তীকালে যৌক্তিক করার প্রচেষ্টা চলে। পাঠকের মন ও মানসিকতার গড়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে, যেখানে এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যায়নি যে গণমাধ্যমের আধেয় ভোক্তাদের মনকে চেতন ও অবচেতনভাবে প্রভাবিত করে।

যা কিছু ঘটে, তা-ই খবর নয়। এটি শুধু এই কারণে নয় যে সব ঘটনাই খবর করবার মতো জায়গা সংবাদপত্রে নেই; বরং এর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিমাপক।

কোনো ঘটনার সত্য বা বস্তুনিষ্ঠ হওয়াই খবর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। রজার রোজেনব্ল্যাটকে উদ্ধৃত করেছেন উইলিস (২০১০)– একজন সাংবাদিকের কাজ হলো এই মুহূর্তে বলটি কোথায় আছে তা বলা; এবং কোথায় নেই, তা না বলা। অর্থাৎ যা ঘটেছে, তা-ই খবর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা ঘটেনি, তা খবর নয়। খবর হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হলো ঘটনার অর্থপূর্ণতা এবং সম্পর্কিত ফলাফল বিবেচনা (আলগার: ১৯৮৯, পৃ. ১০১)। এ জন্যই একজন সংবাদকর্মীকে 'গেটকিপার' বলা হয়। কোন ঘটনা খবর, সেটি জানার পাশাপাশি কোন ঘটনা খবর নয়, সেই বিবেচনাও একজন সংবাদকর্মীর জন্য অপরিহার্য। ডেভিড ব্রোডার বলেন, 'All of us know as journalists that what we are mainly engaged in deciding is *not* what to put *in* but what to leave out.' সাংবাদিক হিসেবে আমাদের কাজ হলো কোন বিষয়টি (খবর হিসেবে) রাখব, তা নয়; বরং কোন বিষয়টি বাদ দেব, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া (ব্রোডার: ১৯৮৭, পৃ. ১৪)। এমন বিষয়কে সংবাদ করতে হবে, যার সংবাদমূল্য (Journalistic merit) রয়েছে; তা নয় যা শুধু পত্রিকার বিক্রি বাড়ায় বা অধিক পাঠক ধরে রাখে (উইলিস: ২০১০, পৃ. ৫৮)। এখানেই তথ্য-উপযোগিতার বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তথ্যের অভিগম্যতা, প্রাপ্যতা এবং কার্যকারিতা সব সমাজ ও দেশের জন্য এক ও অভেদ্য নয় বলে তার প্রক্রিয়া ও পরিবেশনায় সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। পশ্চিমা বিশ্বের গণমাধ্যমের একটি খবর তথ্য উপযোগিতার বিবেচনায় বাংলাদেশের জন্য খবর না-ও হতে পারে, যদি সেই তথ্য সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশের তথ্য ভোক্তাদের কাছে কোনো অর্থপূর্ণতা তৈরি করতে না পারে। খবর হিসেবে কোন বিষয়টিকে রাখা হবে আর কোন বিষয়টিকে বাদ দেওয়া হবে, তার জন্য দরকার 'বাস্তবতা বিবেচনা' বা Reality judgments (গ্যানস: ১৯৮০, পৃ. ২০১)। গ্যানস বলেন, 'In any case, journalists cannot exercise news judgment without a composite of nation, society, and national and social institutions in their collective heads, and this picture is an aggregate of reality judgments.' সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক মূল্যবোধ বিবেচনা বাদ দিয়ে একজন সাংবাদিক খবর নির্ধারণ করতে পারেন না। সমাজের সামষ্টিক উপযোগিতা বিবেচনায় নিয়ে খবর নির্ধারণের/বাছাইয়ের 'বাস্তবতা' উপলব্ধি করতে পারা একজন সংবাদকর্মীর জন্য অপরিহার্য।

বিনোদনমূলক খবর কী ও কেন

সংস্কৃতি ও বিনোদন পরস্পর প্রাসঙ্গিক হলেও প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের নানাবিধ আচরণ, তার চিন্তার ক্ষেত্র, বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা– এসবের সমন্বয়ে নির্মিত একটি ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা হলে বিনোদন তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এই সংস্কৃতি ও বিনোদন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ বলে সাংবাদিকতায়/সংবাদপত্রে

বিনোদনের উপস্থিতি ও উপযোগিতা অপরিহার্য। বিনোদন অধিকাংশ সংবাদপত্র পাঠককে আকৃষ্ট করে বলে প্রতিটি সংবাদপত্রই বিনোদনের খবর প্রকাশ করে (হাসানঃ ২০১০, পৃ. ১৮৯)। মূলত সংস্কৃতি ও বিনোদন সাংবাদিকতা মূল সাংবাদিকতারই অংশ। সাংবাদিকতায় সংস্কৃতি ও বিনোদনের আলাদা ধরন থাকলেও সংস্কৃতি সাংবাদিকতাই এখন পরিণত হয়েছে বিনোদন সাংবাদিকতায় (মুৎসুদ্দীঃ ২০০৭, পৃ. ৭৬)। খবরের যেমন নির্ধারিত ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নেই, তেমনি বিনোদন খবর কী, তার একক মানদণ্ড নিরূপণ করাও কঠিন। সাধারণ কোনো ঘটনা খবর হয় না যে কারণে, বিনোদনের সবকিছুই কিংবা একজন বিনোদনশিল্পীর সবকিছুই একই কারণে খবর হতে পারে না। খবরের সঙ্গে পাঠকের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক স্থাপিত না হলে সেটি খবর হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে মফিদুল হক (১৯৮৫) তাঁর বইয়ে মনজুরুল হকের বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন,

> আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলো প্রায়শই এমন সমস্ত সংবাদ ও ছবি প্রকাশ করে থাকে যার সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোথাও বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে জুলাই মাসের কয়েক দিনে আমাদের দেশের প্রধান দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত কিছু সংবাদ ও ছবির অবতারণা করা মোটেই অযৌক্তিক হবে না। যেমন পশ্চিমা নারীদের ফ্যাশনের ছবি (বাংলাদেশ টাইমস, ২৮ জুলাই), রানি এলিজাবেথ কর্তৃক পঙ্গু শিশুদের ধনুর্বিদ্যার দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ পরিদর্শনের ছবি (সংবাদ, ২৫ জুলাই), রানিমাতার জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ (দৈনিক বাংলা, ২২ জুলাই), বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পোশাকধারিণীদের পুরস্কৃত হওয়ার ছবি (অবজারভার, ২১ জুলাই)... ইত্যাদি (হকঃ ১৯৮১, পৃ. ১৮)।

এমন আরও অনেক উদাহরণ বর্তমান সময়ের মূলধারার গণমাধ্যমেও বিরাজমান। চার্লস-ডায়ানার বিয়ের ছবি বাংলাদেশের সব কটি সংবাদপত্রই যেমন ফলাও করে প্রচার করেছিল, তেমনি বর্তমান সময়ে প্রিন্স উইলিয়াম ও কেট মিডলটনের অনাগত শিশু ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তা নিয়েও বড় খবর ছাপা হয়েছে এ দেশের সংবাদপত্রে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ মার্চ ২০১৩)। বিনোদনের বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ জগৎকে হালকা বা সস্তা করে দেখার অবকাশ নেই। বিনোদন বলেই সেখানে যা খুশি তা-ই খবর হবে, এমন ধারণা সাংবাদিকতার মৌলিক উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতাকে ব্যাহত করে। বরং বিনোদন ও সংস্কৃতি নিয়েও গভীরতর প্রতিবেদন করা যায়। এ ব্যাপারে চিন্ময় মুৎসুদ্দী (২০০৭, পৃ. ১৪৫) বলেন,

> আমাদের সংস্কৃতি সাংবাদিকেরা তথ্য সংগ্রহ ও তা উপস্থাপনে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু তথ্যের গভীরে যাওয়া বা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে দুর্বলতাই বেশি চোখে পড়ে। টিভির অনুষ্ঠান বিষয়ে কোনো মেগা সিরিয়ালের ১০০ পর্ব বা ২০০ পর্ব অতিক্রম করার ঘটনা যেভাবে হাইলাইট করা হয়, মেগা সিরিয়ালের বিষয়,

> আঙ্গিক ও পরিবেশনা রীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ/পর্যালোচনা সেভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়। প্রথম শ্রেণির একটি পত্রিকায় *ফেরদৌসের বিয়ে আগামী বছর* বা *বিপাশা ক্রিকেট খেলার কিছুই জানেন না* ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্যই কি তবে পত্রিকার কলেবর বাড়ছে?...পত্রিকার কলেবর বাড়িয়ে তা পূরণের তাগাদায় সাংবাদিকতার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা পরিণত হয়েছে 'পাতা ভরানোর খেলায়।'

বিনোদনশিল্পী বা সেলিব্রেটিরা খবর হতেই পারেন। সাংবাদিকতায় 'নাম খবর তৈরি করে' বলে একটি কথা চালু আছে। তবে তারও একটি পরিমিতিবোধ থাকা জরুরি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনস্বার্থ-সম্পর্কিত হাজারো বিষয়কে উপেক্ষা করে কিংবা কম গুরুত্ব দিয়ে সেলিব্রেটিদের নিয়ে ডুবে থাকার অবচেতনগত একটি বিরূপ প্রভাব রয়েই যায়। ব্রিটিশ সাংবাদিক মাইক হিউমের মতে, সেলিব্রেটিদের প্রতি গণমাধ্যমের বাড়াবাড়ি রকমের কাভারেজ 'প্রচলিত অন্যান্য ঘটনার খবর হওয়ার পথকে রুদ্ধ করে দেয়' (উইলিস: ২০১০, পৃ. ১০৮)। প্রচলিত অন্যান্য ঘটনার খবর হওয়ার পথকে পুরোপুরি রুদ্ধ করা না হলেও জনগণের মনোযোগ ভিন্নধারায় প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। জনজীবন সহজ-স্বাভাবিক বিষয়ের চেয়ে 'চটুল বিষয়াদি' দ্বারা বেশি পরিব্যাপ্ত, যেগুলো তৈরি করা এবং সাজানো (বুরস্টিন: ১৯৮৫)। কারণ, হিসেবে তিনি বলেন, এসব 'চটুল-মানুষদের' ওপর, যারা সেলিব্রেটি নামে পরিচিত, গণমাধ্যম অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে উদ্দেশ্যমূলক মায়াজাল সৃষ্টি করে বলেই জনগণ তাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

খবরের তথ্য-উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মূলধারার ছয়টি দৈনিক সংবাদপত্রের বিনোদন পাতার খবর সংগ্রহ করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো হলো *প্রথম আলো*, *ইত্তেফাক*, *মানবজমিন*, *যুগান্তর*, *সমকাল* ও *বাংলাদেশ প্রতিদিন*। সব কটি পত্রিকাই প্রায় প্রতিদিন পূর্ণপৃষ্ঠার বিনোদন পাতা প্রকাশ করে। বিজ্ঞাপনের আধিক্য কিংবা অন্য কোনো কারণে দু-একটি পত্রিকা মাঝেমধ্যে অর্ধপৃষ্ঠার বিনোদন পাতা বের করে থাকে। এসব পত্রিকার বিভিন্ন দিনের মোট ১৭টি বাছাইকৃত খবর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আলো

*প্রথম আলো*র বিনোদন পাতার নাম 'বিনোদন'। সপ্তাহের প্রতিদিনই সম্পূর্ণ রঙিন কাগজে এটি প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি প্রতি বৃহস্পতিবার 'আনন্দ' নামে বিশেষ পাতা বের করা হয়, যার বিষয়বস্তু মূলত সংস্কৃতি ও বিনোদন। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন

সময়ে প্রকাশিত *প্রথম আলো*র বিনোদন পাতার পাঁচটি খবর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১৯ আগস্ট ২০১৩ *প্রথম আলো*র বিনোদন পাতার একটি খবরের শিরোনাম: *বিদ্যার সদাইপাতি।* খবরে বলা হয়েছে: 'রোমে গেলে রোমান হতে হয়। আর নিউইয়র্কে গেলে ধুমসে করতে হয় কেনাকাটা। সুযোগটা হাতছাড়া করেননি বিদ্যা বালান। ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিখ্যাত ফিফথ অ্যাভিনিউয়ে ব্যাগ উপচানো কেনাকাটা করেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী।' খবরটি দিয়েছে ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই। পিটিআই এটিকে কোন বিবেচনায় খবর করেছে, তা পিটিআইয়ের ব্যাপার। কিন্তু পিটিআই করেছে বলেই কি বাংলাদেশের প্রথম সারির কোনো সংবাদপত্র সেটিকে অনুবাদ করে খবর হিসেবে পাঠকের সামনে পরিবেশন করবে? বিদ্যা বালানের 'ব্যাগ উপচানো' কেনাকাটার খবর আমাদের দেশের পাঠকের কাছে 'উপচেপড়া' অহেতুক তথ্য ছাড়া আর কী? একজন অভিনেত্রীর স্বাভাবিক কেনাকাটার তথ্য পাঠকের কাছে কোন বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে?

৭ ডিসেম্বর ২০১৩ সালের *প্রথম আলো*র বিনোদন পাতার একটি খবর ছিল এ রকম: *সাইফের জন্য রাঁধেন না কারিনা।* খবরে বলা হয়েছে: 'বিয়ে করেছেন এক বছর হলো। একসঙ্গে থাকছেন ছয় বছরের বেশি সময় ধরে...কিন্তু এখনো নাকি সাইফ আলী খানকে রেঁধে খাওয়াননি কারিনা কাপুর!'
খবরের সঙ্গে নিম্নোক্ত ছবিটি সংযুক্ত করা হয়েছে:

এখন প্রশ্ন হলো, এই তথ্য, অর্থাৎ কারিনা তার স্বামীর জন্য রান্না করেন কি না, সেটি পাঠকের জানার প্রয়োজন কতটুকু। একজন সাংবাদকর্মী খবরের কোন মানদণ্ড দিয়ে এই তথ্যের সংবাদ-উপযোগিতার ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। বাংলাদেশের কোনো পাঠক এই তথ্য না জানলে তিনি কি পিছিয়ে পড়বেন? কিংবা এই তথ্যের মধ্যে আসলে বিনোদনই বা কোথায়? তবে কি একজন বিনোদনকর্মী/শিল্পী 'যা করে' কিংবা 'যা করে না', তা-ই বিনোদন বা বিনোদনের খবর? খবরটিকে যদি খবর বলে ধরে নেওয়াই হয়, তার সঙ্গে মুদ্রিত ছবির সংগতি কী? খবরের বিষয় রান্নাবান্না হলেও প্রকাশিত এই ছবিটি কিসের প্রতিনিধিত্ব করছে?

মুম্বাই মিরর থেকে ২ জুলাই ২০১৩ তারিখে *প্রথম আলো* খবরের শিরোনাম করেছে: *'বিছানা-বিশ্রামে' ক্যাটরিনা।* খবরে বলা হয়েছে: ...২৬ জুন অর্জুন কাপুরের জন্মদিন ছিল। জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দেওয়ার পরদিন থেকে ঘর থেকে বের হচ্ছেন না এই তারকা (ক্যাটরিনা)।...চিকিৎসক জানিয়ে দিয়েছেন, বেশ কিছুদিন 'বিছানা-বিশ্রামের' দরকার। বাধ্য মেয়ের মতো সেটাই করছেন ক্যাটরিনা।'

ক্যাটরিনা কাইফ 'বাধ্য মেয়ের মতো' বিশ্রাম নিচ্ছেন, সেই তথ্য আমাদের জানতে বাধ্য করা হলো কেন? বিশ্রাম নেওয়া মানে কিছু না করা। কিছু না করা খুব কম ক্ষেত্রেই খবর হয়ে থাকে। এই খবরের তথ্য-উপযোগিতা তখনই প্রাসঙ্গিক হতো, যদি ক্যাটরিনার বাংলাদেশে আসার কোনো শিডিউল থাকত এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সেই শিডিউল তিনি বাতিল করে বিশ্রাম নিতেন।

স্কুল খুঁজছেন জেনিফার লোপেজ, এটি ১০ মার্চ ২০১৩ *প্রথম আলোর* বিনোদন পাতার একটি খবর। খবরে লেখা হয়েছে: 'গানের রেকর্ডিং নয়, কনসার্ট নয়, এমনকি অভিনয়ও নয়। জেনিফার লোপেজ তাহলে কী নিয়ে ব্যস্ত আজকাল? লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তাঘাটে চক্কর দিচ্ছেন তিনি; দুই সন্তান এম আর ম্যাক্সের জন্য ভালো একটি স্কুলের সন্ধানে।'

মার্কিন অভিনেত্রীর বাচ্চাদের জন্য স্কুল খুঁজে বেড়ানোর খবর পড়ে বাংলাদেশের পাঠক কী করবে? তার প্রতি সহমর্মিতা দেখাবে? নাকি স্কুল খুঁজে পেতে সহযোগিতা করবে? যে ব্যক্তি এই তথ্য জানেন, আর যে ব্যক্তি জানেন না, তাদের মধ্যে কী পার্থক্য? কোন উপযোগিতায় পাঠকের কাছে এই তথ্য খবর হয়ে ওঠে? জেনিফার লোপেজ খুবই বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তার অভিনীত সিনেমা হতে পারে দর্শকদের বিনোদনের অফুরান উৎস। কিন্তু তিনি বাচ্চাদের জন্য স্কুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এই তথ্যের মধ্যে বিনোদনই বা কোথায়?

প্রথম আলো এমন আরও একটি খবর ছেপেছে ৩০ মার্চ ২০১৩ তারিখে। শিরোনাম: *ঘরে ফিরলেন সোনম।* ভারতীয় অভিনেত্রী সোনম কাপুর দিল্লিতে তিন মাস শুটিং

করে নিজের শহর মুম্বাইয়ে ফিরেছেন। দেশের বাইরেও না; দেশের ভেতরেই আরেকটি শহরে শুটিং করে নিজের শহরে ফেরাটাকে খবর করতে হবে তথ্যের কোন উপযোগিতা বলে? ঘরে ফিরতে গিয়ে তিনি যদি দুর্ঘটনার শিকার হতেন কিংবা অস্বাভাবিক কিছু ঘটত, তাহলে তার একটি সংবাদমূল্য থাকত। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া সোনমের ঘরে ফিরে আসা যখন খবর হয়, তখনই সংবাদপত্রগুলো 'পাতা ভরানোর খেলায়' মেতে ওঠে বলে প্রমাণিত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর বিনোদন পাতার নাম 'শোবিজ'। প্রতিদিনই সম্পূর্ণ রঙিন কাগজে পূর্ণ পৃষ্ঠায় 'শোবিজ' প্রকাশিত হয়। এখানে *বাংলাদেশ প্রতিদিন*-এর বিনোদন পাতার তিনটি খবরের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যায় *বাংলাদেশ প্রতিদিন*-এর বিনোদন পাতার খবরের শিরোনাম *বিয়ে করছেন ক্যাটরিনা?* বলা হয়েছে: 'বলিউডের আকাশে বাতাসে জোর গুঞ্জন– বিয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। শিগগিরই তিনি রণবীর কাপুরকে বিয়ে করতে চাইছেন।...বিয়ের জন্য জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ক্যাটরিনা।' বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের বিয়েসংক্রান্ত নানা খবর-অখবর বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোতে নিয়মিতই জায়গা দখল করে। সেলিব্রেটিদের বিয়ে নিশ্চয়ই খবর। কিন্তু বিয়ে না-হওয়াটা খবর নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা গুজব। গুজব খবর নয়। বলিউড অভিনেতা সালমান খান এখনো পর্যন্ত বিয়ে না করলেও বাংলাদেশের গণমাধ্যম অসংখ্যবার তার 'বিয়ে' দিয়েছে কিংবা বিয়ের আয়োজন করেছে; শেষ পর্যন্ত বিয়েটা দিতে পারেনি। গণমাধ্যমের কাজ ঘটনা ঘটে গেলে তার বিবরণ দেওয়া; গুজব রচনা করা নয়। 'বিয়ে করছেন ক্যাটরিনা'– এই

বিস্ময়

পোশাক তৈরিতে ১৬শ ঘণ্টা

● শোবিজ ডেস্ক

চমক সৃষ্টির জন্য লেডি গাগার তুলনা নেই। নিয়মিত একের পর এক চমক সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি। কারণ একটাই, বিশ্ব মিডিয়ার মনোযোগ নিজের দিকে রাখা। এক্ষেত্রে সফলও। নিয়মিত চমক

তথ্য পেয়ে পাঠকের কী লাভ? বিয়ে হয়ে গেলে বরং খবর করা যেত, 'বিয়ে করেছেন ক্যাটরিনা'। এই প্রতিবেদন যিনি করেছেন, তাকে তো এখন প্রশ্ন করাই যায়, প্রায় দুই বছর হয়ে গেল, বিয়ের জন্য 'মরিয়া হয়ে ওঠা' ক্যাটরিনার বিয়ে তো হলো না! পাঠককে এ রকম একটি 'অখবর' দেওয়ার জন্য প্রতিবেদক নিজেই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কি না কে জানে!

একই দিনে দৈনিকটির আরেকটি খবর, *পোশাক তৈরিতে ১৬শ ঘণ্টা*। খবরের বিষয় হলো অস্কারের ৮৭তম আসরে লেডি গাগা যে পোশাকটি পরে এসেছেন, সেটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ১৬শ ঘণ্টা। ২৫ জন পোশাকশিল্পী মিলে পোশাকটি তৈরি করেছেন। ধরে নেওয়া যাক, এই ঘটনা খবর হওয়ার উপযোগী। কিন্তু এর সঙ্গে লেডি গাগার যে ছবিটি সংযুক্ত করা হয়েছে, সেখানে পোশাক কোথায়? পাঠক তো লেডি গাগাকে নতুন করে দেখতে চায়নি। যে কারণে গাগা খবর হয়েছেন, সেই পোশাক দেখতে চেয়েছে। ছবিতে পোশাকের সামান্য অংশই দেখা গেল। যে পোশাক বানাতে ১৬শ ঘণ্টা ব্যয় হয়, পাঠক তো সেই পোশাকের ষোলো আনাই দেখতে চাইবে। বিস্ময় বটে!

বাংলাদেশ প্রতিদিন ১২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বিনোদন পাতার খবর করেছে *প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে নতুন গুঞ্জন*। বলা হয়েছে: 'এখন প্রিয়াঙ্কা চোপড়ারই সময়। এবিসি

নেটওয়ার্কের 'কুয়ান্টিকো'র মাধ্যমে মার্কিন টিভি সিরিজে দাপুটে অভিষেক হয়েছে তার। এর কাজ করতে গিয়ে ভিনদেশি এক তরুণের প্রেমে পড়েছেন ভারতীয় এই অভিনেত্রী। ডিএনএর প্রতিবেদনে জানিয়েছে, প্রিয়াঙ্কা এখন নতুন পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছেন। নাম-পরিচয় জানা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে, ছেলেটি লসএঞ্জেলেসে থাকে।'

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যতবার প্রেমে পড়বেন, ততবারই বাংলাদেশের গণমাধ্যম তার খবর প্রচার করবে। প্রেমসর্বস্ব এমন বিনোদন খবরের সত্য-মিথ্যা নিয়ে পত্রিকাগুলো কখনো অনুসন্ধান করে না। ধারণানির্ভর এমন সস্তা বিষয়ের খবর-অখবরের গুঞ্জনে সাংবাদিকতা যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তেমনি প্রশ্নবিদ্ধ হয় খবরের তথ্য-উপযোগিতা। প্রিয়াঙ্কার 'নতুন পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর' তথ্য পাওয়ার মধ্যে পাঠকদের জ্ঞানস্তর বৃদ্ধির কিংবা এমনকি বিনোদিত হওয়ারও কোনো উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সামগ্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে 'নতুন পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটানোর' তথ্য গ্রহণযোগ্যতার বিচারেও প্রশ্নবিদ্ধ।

মানবজমিন

মানবজমিন বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত ট্যাবলয়েড পত্রিকা। পত্রিকাটি 'বিনোদন' নামে সপ্তাহের প্রতিদিন বিনোদন পাতা প্রকাশ করে থাকে। অধিকাংশ দিনই বিনোদন পাতা বের হয় চার রঙে। *মানবজমিন*-এর বিভিন্ন সংখ্যার বিনোদন পাতার কয়েকটি খবরের শিরোনাম এ রকম:

- ফিটনেস ভিডিওতে খোলামেলা কোয়েনা (২৪ জানুয়ারি ২০১৪)
- এবার অন্যরকম হট সানি (১৯ নভেম্বর ২০১৩)
- প্রথমবারের মতো বিকিনিতে সোহা (২১ নভেম্বর ২০১৩)
- এবার দীপিকার টার্গেট সালমান (২৫ নভেম্বর ২০১৩)
- প্রেমিকের খোঁজে সেলেনা (৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

শিরোনামগুলো দেখলেই এর ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতা বা তথ্যের উপযোগিতাহীনতা উপলব্ধি করা যায়। এর বাইরে *মানবজমিন*-এর বিভিন্ন তারিখের তিনটি খবরের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

পত্রিকাটি ৭ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে বিনোদন পাতায় একটি খবর ছেপেছে *ফিরছেন আগের চেয়ে বেশি আবেদন নিয়ে* শিরোনামে। অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি বিরতির পর আবারও অভিনয়ে ফিরছেন। 'আগের চেয়ে বেশি আবেদন' নিয়ে ফিরছেন বলে পাঠককে কি একধরনের সুরসুরি দেওয়া হলো না? এই আবেদন কি আগের চেয়ে আরও বেশি ভালো অভিনয়ের আবেদন, নাকি আরও বেশি শরীর প্রদর্শনের আবেদন। এই আবেদনের আগাম তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে পাঠককে বিভ্রান্তিকর ইঙ্গিত

না দিয়ে 'আবার অভিনয়ে ফিরছেন শিল্পা' বললেই তো এটি প্রপাগান্ডা না হয়ে খবর হয়ে যেত। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই খবরের প্রতিবেদক খবরের একেবারে শেষে বলছেন, 'আগের চেয়েও অনেক বেশি আবেদনময়ী শিল্পাকে এখানে উপস্থাপন করা হবে। আশা করছি শিল্পার এই ফিরে আসা দর্শকদের জন্য বড় একটি চমক হিসেবে ধরা দেবে। সবাই অপেক্ষায় থাকুন।' অখবরকে খবর করতে গিয়ে প্রতিবেদক নিজেই অসাংবাদিকতা করে ফেলেছেন। তিনি শুধু সবাইকে 'অপেক্ষায়ই' রাখেননি; 'আশাও' প্রকাশ করেছেন! এটি সাংবাদিকতার ভাষা নয়।

এখনই মা হচ্ছেন না কারিনা শিরোনামে *মানবজমিন* ২৭ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বলা হয়: '...এদিকে ইতিমধ্যে আবারও নিজেদের ছবির শুটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন সাইফ ও কারিনা। তাই দুজনের দেখাও সারা দিনে খুব কম হচ্ছে।...এ বিষয়ে কারিনা কাপুর বলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কমপক্ষে এক বছরের মধ্যে সন্তান নেব না।' সন্তান হলে না হয় খবর হতে পারত। এখনই সন্তান নিচ্ছেন না/এক বছর পরে সন্তান নেবেন– এগুলো জেনে পাঠকের কী লাভ? কারিনা কাপুর কবে সন্তান নেবেন, এ ব্যাপারে আসলেই কি পাঠকের জানার আগ্রহ রয়েছে? নাকি পত্রিকা এই খবর দিয়ে পাঠকের কৃত্রিম আগ্রহ তৈরি করে একধরনের মেকি তথ্য-চাহিদার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করছে?

মানবজমিন-এর ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর খবর *সেলফির প্রেমে কারিনা*। বলা হয়: 'জানা গেছে দিনের বেশির ভাগ সময় সেলফিতে ব্যস্ত থাকেন তিনি (কারিনা)। ৫-১০ মিনিট পরপরই সেলফি তোলেন কারিনা।...তিনি বলেন, আমি হলাম সেলফি কুইন। তাই নিজের ছবি তুলতেই থাকি।'

কারণে-অকারণে কারিনা কাপুর বাংলাদেশের গণমাধ্যমে খবর হন। এবার হয়েছেন সেলফির প্রেমে পড়েছেন বলে। 'দিনের বেশির ভাগ সময় সেলফিতে ব্যস্ত থাকা' কারিনা অভিনয় করেন কখন? সেটি হয়তো তার সিনেমার পরিচালকের ব্যাপার। কিন্তু কারিনা ৫-১০ মিনিট পরপর সেলফি তোলেন, এই তথ্যের সংবাদমূল্য কোথায়? তা ছাড়া সেলফি কোনো ভালো জিনিস নয়। সারা বিশ্বেই সেলফি তোলার ব্যাপারটিকে 'মানসিক ব্যাধি' (Mental Disorder) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (এপিএ) এই রোগের নাম দিয়েছে 'সেলফিটিস' (পল: ২০১৫)। যুক্তরাজ্যের *টেলিগ্রাফ* পত্রিকা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বে যত মানুষ হাঙ্গরের আক্রমণে মারা গেছে, তার চেয়ে বেশি মারা গেছে সেলফি তুলতে গিয়ে। বাংলাদেশেও সেলফি তুলতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে কিংবা হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এমন প্রেক্ষাপটে কারিনা কাপুরের 'সেলফি-প্রেমে'র খবর সেলফির প্রতি একধরনের উসকানিমূলক প্ররোচনাও বটে।

ইত্তেফাক

ইত্তেফাক বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন সংবাদপত্র। পত্রিকাটি 'বিনোদন প্রতিদিন' নামে পুরো সপ্তাহজুড়ে বিনোদনের খবর প্রকাশ করে থাকে। অধিকাংশ দিনই পূর্ণপাতার বিনোদনের খবরগুলো চার রঙে ছাপা হয়। ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত *ইত্তেফাক*-এর বিনোদন পাতার দুটি খবর পর্যালোচনা করা হলো।

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ *ইত্তেফাক*-এর বিনোদন পাতার একটি খবর: *প্রেমের জন্য সময় নেই*। খবরের শুরুটা এ রকম, 'ক্যারিয়ারের খবরের পাশাপাশি প্রেমের গুঞ্জনেও নিয়মিত শিরোনামে আসেন বলিউড তারকারা। তবে সেই জায়গা থেকে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ হয়তো একটু পিছিয়েই আছেন। কারণ তাকে নিয়ে তেমন কোনো প্রেম গুঞ্জন নেই বলিউড পাড়ায়।....জ্যাকুলিন বলেন, অনেকেই ভাবেন হয়তো আমি লুকিয়ে প্রেম করি। কিন্তু বিষয়টি একদমই তা নয়। আসলে প্রেমের জন্য সময় নেই।...তবে প্রেম হলে লুকিয়ে করব না। সবাই জানবেন আমার জীবনসঙ্গীর কথা।' জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের প্রেম করার সময় নেই, এটি তার 'পিছিয়ে থাকা'র কারণ হলেও পাঠককে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই তথ্য কী ভূমিকা রাখবে, প্রশ্ন করাই যায়। প্রতিবেদক নিজেই স্বীকার করেছেন, খবরের পাশাপাশি প্রেমের গুঞ্জনেও নিয়মিত শিরোনামে আসেন বলিউড তারকারা। তার মানে সত্যিকারের প্রেম হলেও খবর হয়, প্রেমের গুঞ্জন হলেও খবর হয়! যদিও সাংবাদিকতার ব্যাকরণে 'গুঞ্জন' খবর নয়। একজন চিত্রনায়িকা প্রেমে পড়লেন কি পড়লেন না, তার প্রেমে পড়ার সময় আছে কি নেই, প্রেম লুকিয়ে করবেন নাকি প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে করবেন, এসব তথ্য পাঠককে জানানো কিংবা জানতে বাধ্য করা সাংবাদিকতার কাজ নয়। একজন বিনোদনশিল্পী যা-ই করেন কিংবা বলেন, তা-ই বিনোদনের আধেয় হয় না।

১৮ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে *ইত্তেফাক* অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের মেয়ে মুনমুন সেনের কথা নিয়ে একটি খবর ছাপে। খবরের শিরোনাম: *ধন্য এমন মা'কে পেয়ে*। সুচিত্রা সেনের মতো একজন মা পেয়ে অভিনেত্রী মুনমুন সেন আপ্লুত। সেটি হতেই পারে। কিন্তু এই খবরের সঙ্গে যে ছবিটি সংযুক্ত করা হয়েছে, তা কি অপরিহার্য ছিল? ছবিটি ছিল এই:

এই খবরের সঙ্গে এই ছবিটি বাছাই করার কারণ কী? এখানে যত না মেয়ের প্রতি মায়ের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে অশ্লীলতা। ভালোবাসা প্রকাশ পায়, এমন কোনো বিকল্প ছবি যদি না-ও পাওয়া যায়, তবে ছবি না দিয়েও তো খরবটি ছাপা যেত। এই ছবিটির বার্তা সহজবোধ্য হলেও এর উপযোগিতা প্রশ্নবিদ্ধ। এর মধ্য দিয়ে হয়তো বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সুচিত্রা সেন মুনমুন সেনকে শাড়ি পরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে মেয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই ছবির আবেদন কী? বাংলাদেশের কোন মা মেয়েকে প্রয়োজনে শাড়ি পরিয়ে দেন না?

সমকাল

সমকাল-এর বিনোদন পাতার নাম 'আনন্দ প্রতিদিন'। পত্রিকাটি সাধারণত অর্ধপৃষ্ঠার বিনোদন পাতা প্রকাশ করে থাকে। এখানে *সমকাল*-এ প্রকাশিত দুটি বিনোদনমূলক খবরের তথ্য-উপযোগিতা যাচাই করা হলো।

২০ জানুয়ারি ২০১৪ *সমকাল* একটি খবর ছাপে *দাহর কাঠ শ্মশানে থাকবে তিন দিন* শিরোনামে। এখানে সুচিত্রা সেনের দাহর কথা বলা হয়েছে। খবরে বলা হয়, 'কেওড়াতলা মহাশ্মশান থেকে তিন দিনের জন্য সরানো হবে না সুচিত্রা সেনের পোড়া কাঠ।...মহানায়িকার একমাত্র কন্যা মুনমুন সেন রাজ্য সরকারের কাছে এ অনুরোধ জানিয়েছেন।' সুচিত্রা সেন নিঃসন্দেহে উপমহাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। বাংলাদেশেও তার অসংখ্য ভক্ত-দর্শক রয়েছে। সে হিসেবে তার মৃত্যু বাংলাদেশের গণমাধ্যমে খবর হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে কোনো কোনো গণমাধ্যম সুচিত্রা সেনকে এত বেশি কাভারেজ দিয়েছে এবং কাভারেজ দিতে গিয়ে এত বেশি অপেশাদারত্ব দেখিয়েছে, যা শুদ্ধ সাংবাদিকতার পরিপন্থী। সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা, যেখানে বস্তুনিষ্ঠতাই শেষ কথা নয়; ব্যালান্স বা ভারসাম্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। সেই মানদণ্ডকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে ওপরের খবরটি। সুচিত্রা সেন

কিংবা সুচিত্রা সেনের মৃত্যু খবর হিসেবে যতই তাৎপর্যপূর্ণ হোক না কেন, মৃত সুচিত্রা সেনের দাহর কাঠ শ্মশানে কত দিন থাকবে, সেটি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে খবর হওয়ার উপযোগিতা রাখে না। বাংলাদেশের গণমাধ্যম-ভোক্তাদের কাছে এই তথ্য অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়।

পত্রিকাটি ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে খবর ছাপে *মাইলির অদ্ভুত ইচ্ছা* শিরোনামে। খবরে বলা হয়: 'পপতারকা এলভিস প্রিসলি মারা গেছে মাইলির শৈশবকালে। আর তাকেই বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করলেন হলিউডের ২২ বছর বয়সী এ গায়িকা ও অভিনেত্রী। সম্প্রতি তার অনলাইন সাইটের ট্রাম্বলার "অ্যানসার টাইম"-এ ভক্তদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি।...তাকে তার বয়ফ্রেন্ডের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে এলভিস প্রিসলির নাম উচ্চারণ করেন এবং তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেন।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গায়িকা ও অভিনেত্রী মাইলি বাংলাদেশে খুব বেশি পরিচিত হওয়ার কথা নয়। *সমকাল*-এ যিনি খবরটি করেছেন, তিনি হয়তো পেশাগত কারণে বা ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে মাইলিকে চেনেন। কিন্তু সেটিকে খবর করার জন্য তো পাঠকদের কাছে মাইলির ব্যাপক পরিচিতি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাইলি কাকে বিয়ে করতে চান, এই খবর তখনো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপযোগী কি না, যখন বিয়ে করতে চাওয়া সেই 'পাত্র' অনেক আগেই মারা গেছেন! এই খবর *সমকাল*-এ ছাপা না হলে পাঠকের বিনোদনের কী ঘাটতি হতো কিংবা এই খবর ছাপার ফলে পাঠক কতটুকুই বা বিনোদিত হলো?

যুগান্তর

যুগান্তর বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহে ছয় দিন বিনোদন পাতা বের করে থাকে 'আনন্দ নগর' নামে। পাতাটি কখনো সম্পূর্ণ রঙিন, আবার কখনো সাদাকালো। এই প্রবন্ধে *যুগান্তর*-এর দুটি খবর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে *যুগান্তর*-এর খবরের শিরোনাম *গুঞ্জন শুনি*। খবরে বলা হয়: 'সম্প্রতি একটি গুঞ্জন উঠেছে অভিনেত্রী অ্যামি জ্যাক্সনকে নিয়ে। তিনি নাকি নতুন করে প্রেমে পড়েছেন। গুঞ্জন উঠেছে অভিনেতা উপেন প্যাটেলের সঙ্গে নাকি চুটিয়ে প্রেম করছেন এ অভিনেত্রী। কয়েক মাস আগে কারিশমা তান্নার সঙ্গে ব্রেকআপ হয় উপেন প্যাটেলের। মুম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় নাকি একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অ্যামি এবং উপেন। সম্প্রতি একটি রেস্তোরাঁয় নাকি একসঙ্গে ক্যামেরাবন্দিও হয়েছেন তারা।...তবে সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন তাদের

সম্পর্কে এমন ঘটনা ভক্তমহলে বেশ আগ্রহের খোরাক জুগিয়েছে।' একজন অভিনেত্রী নতুন করে প্রেমে পড়েছেন এবং চুটিয়ে প্রেম করছেন, এই তথ্য জেনে পাঠকের কী লাভ? এ সমস্ত অভিনেত্রীর প্রেমে পড়া অতঃপর আবার নতুন করে প্রেমে পড়ার ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটছে। এসব খবরে পাঠকের জন্য বার্তা কী? শুধু তথ্য-উপযোগিতার বিচারেই এই খবর প্রশ্নের সম্মুখীন তা নয়, সাংবাদিকতার ব্যাকরণের মানদণ্ডেও এটি খবর হয়ে ওঠেনি। কারণ, প্রতিবেদক বলেই দিয়েছেন, 'সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন...', তার মানে এই তথ্য সত্য না-ও হতে পারে। সত্য না হলে সেটি খবর হয় কীভাবে? যে তথ্যের সূত্র এবং বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি, সেই তথ্য দিয়ে খবর করার যৌক্তিকতা কী, যখন সেই খবর এমনকি নিজের দেশেরও নয়?

এক বছর পর পর্দায় ফিরছে

● **আনন্দনগর প্রতিবেদক**

এক বছর পর আবারও সিনেপর্দায় ফিরছেন চিত্রনায়িকা আইরিন। সর্বশেষ তাকে গত বছরের অক্টোবরে মুক্তিপ্রাপ্ত 'জেলেটি আবোল তাবোল মেয়েটি পাগল পাগল' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এবার তিনি আসছেন এসএ হক অলীক পরিচালিত 'এক পৃথিবী প্রেম' নিয়ে। ২১ অক্টোবর ছবিটি মুক্তি পাবে। এটি তার চতুর্থ ছবি। এর আগে তার অভিনীত তিনটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। এক পৃথিবী প্রেম ছবিতে আলো নামে একটি মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আইরিন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সিনেমাটির গল্প, স্টোরি লাইনআপ এবং সর্বোপরি

যুগান্তর ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে খবর করেছে *এক বছর পর পর্দায় ফিরছেন আইরিন*। খবরের বিষয়বস্তু হলো, এক বছর পর নতুন কোনো সিনেমাতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন অভিনেত্রী আইরিন। বিনোদনের খবর হিসেবে অবশ্যই এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু খবরের সঙ্গে যে ছবিটি জুড়ে দেওয়া হলো, তার গ্রহণযোগ্যতা বা উপযোগিতা প্রশ্নাতীত নয়।

এই খবরটি করার জন্য আইরিনের এই ছবিটিই কি অবধারিত ছিল? সিনেমা হলে গিয়ে হয়তো এই ছবিটিই দর্শক দেখবে। কিন্তু সিনেমা হল আর সংবাদপত্র তো এক জিনিস নয়। সিনেমারও তো সেন্সরবোর্ড রয়েছে। সংবাদপত্রের কি 'গেটকিপিং' নেই? প্রতিবেদক আইরিনের অন্য অনেক ছবির মধ্য থেকে বাছাই করে এই ছবিটি দিয়েছেন নিশ্চয়ই কোনো একটি মানদণ্ড সামনে রেখে। সেটি কী? সাংবাদিক এখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পাঠকমানসে একধরনের লোলুপ এবং বিকৃত রুচির অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেয়েছেন, সাংবাদিকতার মানদণ্ডে যা প্রত্যাশিত নয়। এখানে আইরিনের খবরের চেয়েও বড় হয়ে উঠছে আইরিনের শরীর।

উপসংহার

উপস্থাপিত খবরগুলো বিচ্ছিন্নভাবে ও উদ্দেশ্যমূলক বাছাই করা। বিনোদন পাতার কোনো খবরেরই তথ্য-উপযোগিতা নেই, কিংবা বিনোদন পাতার সব খবরই অপ্রয়োজনীয় এমন সাধারণীকরণ এখানে প্রযোজ্য নয়। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্যই ছিল প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যেও কিছু অপ্রয়োজনীয়/উপযোগিতাহীন খবর সামগ্রিকভাবে বিনোদন পাতার আধেয়কেই যে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দিতে পারে, তার বিশ্লেষণ তুলে ধরা। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি গণমাধ্যমকে অপরিমেয় গতি ও ব্যাপ্তি দিয়েছে, যা তথ্যপ্রাপ্তিকে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে করেছে সহজলভ্য। কিন্তু তথ্য-বিস্ফোরণের এই সময়ে তথ্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তথ্যের উপযোগিতাবোধ। ফ্রেডরিক উইলিয়ামস (উইলিয়ামস: ১৯৯১) সে কথাই বলেছেন, 'What we need is more wisdom, not more information.' প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা না গেলে সমাজ ও জনমানস গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। গণমাধ্যম সমাজকে যেমন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তেমনি সামাজিক সমস্যাও তৈরি করতে পারে (আহমেদ, ফেরদৌস ও ইসলাম: ২০০৯, পৃ. ৩৭)। বিনোদন পাতার খবরের বিষয় নির্বাচনে তাই সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ, জনসংস্কৃতির ধারা এবং সর্বোপরি তথ্য-উপযোগিতাকে বিবেচনায় নিতে হবে।

বিনোদন খবরও মূলধারার খবর। এটিকে হালকা, চটুল, সস্তা খবরে পরিণত করা হলে আদতে তা হয়ে ওঠে সাংবাদিকতার মৌলিক চেতনারই পরিপন্থী। রানিমাতার জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার খবরই হোক আর সানি লিওনির অন্তর্বাস চুরির ঘটনাই হোক, এই সব সংবাদ কেবল যে আমাদের পত্রিকায় জায়গার অপচয় ঘটাচ্ছে তা নয়, এমন সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জীবন ও জগৎ বিচারের একটি মাপকাঠিও পাঠকের মনে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে (হক: ১৯৮৫, পৃ. ৭৫)। বলা বাহুল্য, এই মাপকাঠি জীবনকে সস্তা,

ভোগসর্বস্ব, পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে দেখার মাপকাঠি। বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদপত্রগুলোকে বিনোদন পাতার আধেয় নির্ধারণে এবং ছবি বাছাইয়ে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। তথ্য-উপযোগিতার বিবেচনাকে আরও গঠনমূলক ও কার্যকর করতে হবে। পাঠকের তথ্য-চাহিদা বিনির্মাণে আরও সজাগ ও সচেতন হতে হবে।

লেখক পরিচিতি : **ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ,** অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রফিকুজজামান, সহকারী অধ্যাপক, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, এম আই ইউ, ঢাকা।

তথ্যসহায়িকা

১. আহমেদ, মুসতাক; ফেরদৌস, নূর-এ-জান্নাতুল ও ইসলাম, হোজ্জাতুল সম্পাদিত, ২০০৯. *কর্পোরেট মিডিয়ার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন*, শ্রাবণ, ঢাকা

২. আলগার, ডিন ই, ১৯৮৯. *দি মিডিয়া অ্যান্ড পলিটিকস*, প্রেনটাইস-হল ইনক, নিউ জার্সি

৩. উইলিয়ামস, ফ্রেডরিক, ১৯৯১, *দি নিউ কমিউনিকেশনস*, ওয়াডসওর্থ পাব কো, ক্যালিফোর্নিয়া

৪. উইলিস, জিম, ২০১০, *দি মাইন্ড অব আ জার্নালিস্ট*, সেজ পাবলিসেকশন্স, ইনক, ক্যালিফোর্নিয়া

৫. ওয়ারেন, কার্ল, ১৯৫৯. *মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং*, হারপার অ্যান্ড র, পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড ইভাস্টন

৬. গ্যানস, হারবার্ট, ১৯৮০, *ডিসাইডিং হোয়াটস নিউজ*, ভিনটেজ বুকস, নিউইয়র্ক,

৭. পল, সমিতা, ২০১৫, *টেকিং টু মেনি সেলফিস ইজ আ মেন্টাল ডিসঅর্ডার: ডক্টরস*, (online), Available at: < > [Accessed 25 October 2016].

৮. ফেরদৌস, রোবায়েত ও সালাম, মুহাম্মদ আনওয়ারুস, ২০০৯, *গণমাধ্যম ও শ্রেণিমাধ্যম*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা

৯. ব্রোডার, ডেভিড, ১৯৮৭, *বিহাইন্ড দ্য ফ্রন্ট পেইজ*, সিমন অ্যান্ড সাস্টার, নিউইয়র্ক

১০. বুরস্টিন, ডেনিয়েল, ১৯৮৫, *দি ইমেজ: আ গাইড টু স্যুডো-ইভেন্ট ইন আমেরিকা*, নিউইয়র্ক

১১. মুৎসুদ্দী, চিন্ময়, ২০০৭, *সংস্কৃতি সাংবাদিকতার স্বরূপ*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা

১২. হক, মফিদুল, ১৯৮৫, *মনোজগতে উপনিবেশ: তথ্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিবৃত্ত*, প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা

১৩. হক, মনজুরুল (১৯৮১), *মুক্তির দিগন্ত*, বর্ষ ১, সংখ্যা ৬, সেপ্টেম্বর, ঢাকা

১৪. হাসান, সিমা, ২০১০, *ম্যাস কমিউনিকেশন: প্রিন্সিপালস অ্যান্ড কনসেপ্টস*, সিবিএস পাবলিসার্শ অ্যান্ড ডিসট্রিবিউটরস, নয়াদিল্লি

১৫. হোহেনবার্গ, জন, ১৯৭৩, *দি প্রফেশনাল জার্নালিস্ট: আ গাইড টু দ্য প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস অব দ্য নিউজ মিডিয়া*, হল্ট, রাইনহার্ট অ্যান্ড উইন্সটন, ইনক, নিউইয়র্ক

১৬. হ্যারিস, জুলিয়ান; লেইটার, কেলি; অ্যান্ড জনসন, স্ট্যানলি, ১৯৮১, *দি কমপ্লিট রিপোর্টার*, ম্যাককালাম পাবলিসিং কো, ইনক, নিউইয়র্ক

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য

ড. রওশন আরা

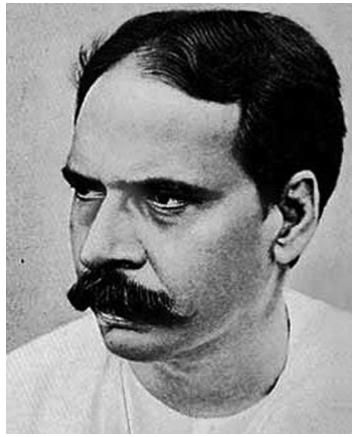

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী অনন্য প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্যজগতে নানামুখী পদচারণে কেবল তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যই অন্য সকল বিভাগকে অতিক্রম করে গেছে। মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবই ব্যাপকতর। 'অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় যেভাবেই উপস্থাপন করা হোক না কেন, তিনি যে প্রধানত, বুদ্ধিবৃত্তিবাদী লেখক, মন অপেক্ষা মননের গভীরতায় তাঁর উপস্থিতি দৃঢ়, যৌক্তিক শৃঙ্খলায় যাঁর লেখনী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি; এ বিষয়টি তাঁর শিল্পসৃষ্টির যে কোনো শাখায় দৃষ্টিপাত করলেই জানা সম্ভব।' 'চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় প্রবন্ধসাহিত্যের এলাকাভুক্ত, তাই বীরবলের বিচিত্র-রসিক মন সম্ভবত প্রবন্ধের মাধ্যমেই অধিকতর সার্থক হয়েছে। বীরবলী গদ্য স্টাইল বলতে যা বোঝায়, প্রবন্ধাবলিই তার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বিষয়ের নানামুখী বৈচিত্র্যে ও প্রকাশরীতির অভিনবত্বে তিনি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেছেন।'

প্রমথ চৌধুরী এমন এক শিল্পী, যাঁর শিল্পে স্বাতন্ত্র্যের বিচ্ছুরণ আছে, কিন্তু তথাকথিত দাম্ভিকতা নেই। বহু গ্রন্থ পাঠের প্রাঞ্জল মাধুর্য আছে। কিন্তু যথার্থভাবে গ্রাম্য উন্নাসিকতা বলতে যা বোঝায়, তা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, উপমা, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বক্রোক্তি-কূটভাষের অগ্ন্যুৎপাতে তা বলেছেন সরাসরি। যুক্তি, জ্ঞান ও পঠনের প্রাখর্যে তিনি তা বলেছেন এবং একান্তভাবেই নিজস্ব স্টাইলে তা

বলেছেন। তাঁর সাহিত্যে বক্তব্য পরিবেশনের কোনো গোঁজামিলের প্রমাণ নেই। জ্ঞানের যে সততা তাঁর মধ্যে অবলোকন করা গিয়েছে, সে সততা কখনো নিজের মুখ থেকে পাঠকের দিক ছুড়ে দিয়েছেন, কখনো আবার নিজেই পাঠক হয়ে নিজ লেখকসত্তার দিকে এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। 'মূলত, বাংলা সাহিত্য ও তার প্রবহমান ধারা বিষয়ে তাঁর নিখুঁত ও স্বতন্ত্র অনুভব ছিল। এমনকি নিজ ভাষা ও সাহিত্যের বাইরে ইউরোপের একাধিক ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও তার চালচলন সম্পর্কে সাধারণ উচ্চশিক্ষিত বাঙালি সমাজ অপেক্ষা প্রমথ চৌধুরীর জ্ঞান অনেক বেশি প্রসারিত ছিল বলেই বাঙালির আত্মকেন্দ্রিকতার উৎস বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ, প্রখর। তাই বীরবল হিসেবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং এ কারণেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তাঁর লেখায় নিমেষে ঘুরেফিরে এসেছে এবং এসেছে বিচিত্র আঙ্গিকে।

প্রবন্ধসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। আর তা স্বীকার করে অনায়াসেই বলা যায় যে প্রাক্-সবুজপত্র অধ্যায়ে প্রবন্ধসাহিত্যের পূর্ণ সমৃদ্ধিই ঘটেছিল। অনলংকৃত বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধ দিয়েই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল, এ কথা অনস্বীকার্য। অবশ্য বঙ্গদর্শনের পূর্বে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে সাহিত্যিক মেজাজটি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। তখন বাংলা সাহিত্যে দুটি ধারা Formal ও Familiar পাশাপাশি চলছিল। রবীন্দ্রযুগে শেষ ধারাটি নানা বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এই ধারাটিই নববৈচিত্র্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে। প্রত্নতত্ত্ব থেকে সমসাময়িক রাজনীতি পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় নেই যা তাঁর প্রবন্ধে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁর মনে এমন আলো আছে, বলার এমন কৌশল আছে, যা সবকিছুকেই পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। এত জেনেও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে জানানোর তাগিদ ছিল না কোনো দিনও। অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন তাঁর রচনাকে কোথাও ভারী করে তোলেনি। অতএব, এটা স্পষ্ট যে 'প্রমথ চৌধুরীর মনের প্রবণতা ছিল বিচিত্রমুখী। বহুজ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানের অন্তর্ভেদী রূপ বিশ্লেষণেই তাঁর জীবনের প্রধান নেশা ছিল। তাই বিচিত্র ধরনের বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। দেশ, সমাজ, যুগ, সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি কোনোদিকেই তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে তাই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছে'। (জীবেন্দ্র সিংহ, ২০০২ : ৮৩)

প্রমথ চৌধুরীর বিচিত্র বিষয়াশ্রিত প্রবন্ধসম্ভারের মধ্যে সাহিত্যসম্পর্কিত প্রবন্ধের সংখ্যাই বেশি। আমরা জানি, বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব সাহিত্যসমালোচক হিসেবে। 'তিনি যখন এমএ ক্লাসের ছাত্র, তখন জয়দেবের ওপর একটি সমালোচনা লেখেন। জয়দেবের কবিপ্রতিভাকে তিনি খুব উচ্চে স্থান দেননি। এতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ খুব ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এই তরুণ

লেখককে উৎসাহিত করে বলেছিলেন, 'এতকাল পরে বাংলায় একটি নূতন লেখকের আবির্ভাব হলো। *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রবন্ধের কিয়দংশ বাদ দিয়ে ছেপেছিলেন। পরে পূর্ণাঙ্গ রচনাটি *সবুজপত্রে* প্রকাশিত হয়'। (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৬৯ : ১৪৭)

তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'জয়দেব'। প্রথম প্রবন্ধেই তিনি সকলকে চমকে দিলেন এবং চিন্তাশক্তির মৌলিকতা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দিলেন। প্রমথ চৌধুরী কাব্য হিসেবে *গীতগোবিন্দের* বিচার করেছেন। এখানে কোনো আধ্যাত্মিকতার সন্ধান মেলেনি– রাধা-কৃষ্ণও সম্ভোগে মত্ত মানব-মানবী ছাড়া আর কিছুই নয়। লেখকের কথায় তা স্পষ্ট, 'আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমাদেরই মতো রক্তমাংসে গঠিত মানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রেমকেও স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত সাধারণ মানবপ্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি'। (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১৭)

এই প্রবন্ধে দেহজ আকাঙ্ক্ষা, বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্টই মূল বক্তব্য হিসেবে এসেছে। এ ছাড়া জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনার মধ্যেও কোনো সজীবতা নেই। কালিদাসের যক্ষবধূর বিরহের তুলনায় জয়দেবের বিরহ ম্লান ও নিতান্ত প্রথানির্ভর। জয়দেবের অভিসার বর্ণনাতেও বৈচিত্র্যহীনতা রয়েছে। কেননা, সেখানে অভিসারিকার হৃদয়াবেগের বর্ণনা নেই। তিনি বলেন, 'যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, মানবদেহের সৌন্দর্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানবদেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎপরিচয় নাই। যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক– এক কথায়, যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ২৯)

'মহাভারত ও গীতা' প্রবন্ধটির বিষয় হলো লোকমান্য তিলকের সুবৃহৎ গীতাভাষ্য, যার বঙ্গানুবাদ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিলক বিভিন্ন শাস্ত্র-পুরাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে তাঁর এই মহাভাষ্য রচনা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থের নাম *কর্মযোগ*। গীতাকে যাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁরা নিজ সম্প্রদায় অনুযায়ীই করেছেন। তিলক নিজে কর্মযোগী ছিলেন বলে তাঁর গীতাভাষ্যও তাই তাঁর জীবন-দৃষ্টিরই অনুকূল হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধটিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমাংশে প্রবন্ধকার তিলক গীতাভাষ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; গীতার অন্যান্য ভাষ্যের সঙ্গে এই ভাষ্যের প্রভেদ কোথায়, তা-ও সংক্ষেপে বলেছেন। প্রবন্ধটির দ্বিতীয়াংশই আসল। সেখানে মহাভারত এক হাতের লেখা কি না, এর প্রক্ষিপ্ত অংশ কতখানি, এ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন প্রবন্ধকার।

মহাভারতের বিশালত্ব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের স্তম্ভিত করেছে। কিন্তু বর্তমান মহাভারত মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারতকে শুধু কাব্য হিসেবে বিচার করতে গিয়েই বিভ্রান্ত হয়েছেন, আসলে মহাভারত হচ্ছে একটি বিপুল-কলেবর এনসাইক্লোপিডিয়া। মহাভারত একাধারে কাব্য ও এনসাইক্লোপিডিয়া। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'বর্তমান মহাভারতকে কাব্য বলা যায় কি না, সে বিষয়ে স্বয়ং ব্রহ্মারও সন্দেহ ছিল। কিন্তু তিনি যে ও-গ্রন্থকে অবশেষে কাব্য বলতে স্বীকৃত হয়েছিলেন, তার কারণ মহাভারত একাধারে কাব্য আর এনসাইক্লোপিডিয়া; এবং এই দুই বস্তু একই গ্রন্থের অন্তর্ভূত হলেও মিলেমিশে একদম একাকার হয়ে যায়নি, মোটামুটি হিসেবে উভয়েই চিরকাল নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছে।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১৮৩)

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই কাব্যের নাম ছিল ভারত, তারপরে নাম হয়েছে মহাভারত। বর্তমানে আমরা মহাভারত পাচ্ছি, কিন্তু ভারত কী হলো। তাই যদি হয় তা হলে মহাভারতের মহত্ব ও গুরুত্বের চাপে ভিতর থেকে জয়ের ক্ষুদ্র দেহ উদ্ধার করা অসম্ভব। ভারত যে লুপ্ত হয় নি, এ বিষয়ে আমি মহাত্মা তিলকের মত শিরোধার্য করি, কারণ সে কাব্যের লুপ্ত হবার কোনো কারণ নেই। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, সব গ্রন্থই হাতে লিখতে হত। সুতরাং উপযুক্ত লেখকের অভাবে বড়ো ভারতেরই লুপ্ত হবার কথা, ছোট ভারতের নয়।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১৮৫)

'হর্ষচরিত' একটি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের হর্ষবর্ধন-সম্পর্কিত ইংরেজি বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে প্রবন্ধটি লেখা। হর্ষবর্ধনের ওপর দুজন লেখকের দুটি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। একজন হলেন চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং আর একজন হলেন বাণভট্ট। দুটি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় *নব হর্ষচরিত* বইটি রচনা করেন। প্রমথ চৌধুরী এই বইটির আলোচনা প্রসঙ্গেই 'হর্ষচরিত' প্রবন্ধটি লেখেন।

বাণভট্টের গ্রন্থের কথাবস্তু সামান্য, অথচ রাধাকুমুদবাবু একেই অবলম্বন করে ইতিহাস লিখেছেন। ফলে কাব্যের মাল-মসলা বর্জন করে তিনি অনেক ক্ষেত্রে বাণভট্টের ক্ষীণ কলেবর কথাবস্তুর ওপরেই নির্ভর করেছেন। রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার মৃত্যুর পর বিন্ধ্যারণ্যে রাজাশ্রীকে হর্ষবর্ধন যেখানে আত্মবিসর্জন থেকে নিবৃত্ত করে বৈরনির্যাতনের সংকল্প করেন, সেখানেই বাণভট্টের কাহিনির উপসংহার। প্রবন্ধের এই অংশের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই– বাণভট্ট ও রাধাকুমুদবাবুর গল্পাংশকেই চৌধুরী মহাশয় সাজিয়ে গুছিয়ে বলেছেন মাত্র। (রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৬৯ : ১৫৬)

প্রবন্ধটির শেষে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। বিষয়গুলো হলো হর্ষের মা যশোবতীর পরিচয়, দ্বিতীয়ত হর্ষের রাজ্যশাসন, তৃতীয়ত হূন প্রসঙ্গ। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, যশোবতী হূনারি যশোবর্মণের কন্যা-যশোবর্মণের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের এই

মত অস্বীকার করে বলেন, 'বাণভট্ট এইমাত্র বলেছেন যে, ভণ্ডি যশোবতীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু যশোবতী যে কার কন্যা ও কার ভগ্নী সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, যশোবতী হূনারি যশোবর্মনের কন্যা। যশোবর্মন যে-সে রাজা নন। হূনরাজ মিহিরকুলকে যুদ্ধে পরাভূত করে তিনি ভারতবর্ষ নিহূন করেন, এবং এক দিকে ব্রহ্মপুত্র হতে পশ্চিমসমুদ্র ও আর একদিকে হিমালয় হতে মহেন্দ্রপর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট হন। যশোবতী এ হেন রাজচক্রবর্তীর কন্যা হলে বাণভট্ট সে কথা গোপন করতেন না। আর যশোবর্মনের পুত্র শিলাদিত্যই নাকি ভণ্ডির পিতা, যে রাজার বিরুদ্ধে লড়ে ভণ্ডি ও রাজ্যবর্ধন জয়লাভ করেন। রাধাকুমুদবাবু যা বলেছেন তা হতে পারে। কিন্তু এ বংশাবলি আঁকে মেলে না। যশোবর্মন হূন নিপাত করেছিলেন ৫২৮ খ্রিস্টাব্দে সুতরাং বিয়ের সময়ে যশোবতীর বয়স কত ছিল? সে কালে রাজারাজড়াদের ঘরের মেয়েদের কোন্ বয়সে বিয়ের ফুল ফুটত, তা রাজ্যশ্রীর বিবাহ থেকেই জানা যায়। সুতরাং ভণ্ডি যে যশোবর্মনের পৌত্র, এ অনুমান প্রমাণভাবে অসিদ্ধ।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ২৩৮)

প্রমথ চৌধুরী মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রকে নিয়ে লিখেছেন 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটি। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর লেখায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব সর্বাধিক। দীর্ঘ দুইশ বছরের ব্যবধান অতিক্রম করে প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের মধ্যে যেন নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। ভারতচন্দ্র যে তাঁর কত বড় প্রিয় লেখক ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর বহু লেখায় ছড়িয়ে আছে। বহু দেশের সাহিত্যের ওপর তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। তারপরও তিনি কোনো দেশের সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি নেননি। ভারতচন্দ্রের লেখা থেকেই তিনি উদ্ধৃতি নিয়েছেন। মূলত প্রমথ চৌধুরী 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে কবি ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার নানা দিক তুলে ধরেছেন। শুধু কবিপ্রতিভায় নয়, তিনি সুকৌশলে ও বিচিত্র ভঙ্গিতে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধকার তাঁর স্বভাবজাত পরিহাসের সুরে প্রবন্ধটি শুরু করেছেন। কালের কষ্টিপাথরে একশ আশি বছর পরও যে ভারতচন্দ্রের কবিখ্যাতি সমুজ্জ্বল তা বলেছেন এভাবে, 'ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশো আশি বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অথচ আজও আমরা তাঁর নাম ভুলি নি, তাঁর রচিত কাব্যও ভুলি নি, এমন-কি, তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছি'। (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ২০৯)

ভারতচন্দ্র দীর্ঘকাল ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবন যাপন করেছিলেন। এ প্রবন্ধের মধ্যে তা উল্লেখ করে এটাই প্রমাণ করেছেন যে এটি কোনো সাধারণ আর্টিস্টের পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ জীবনের বাস্তবতার দুঃসময়কে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে একমাত্র খাঁটি আর্টিস্টই হাসতে পারেন। ভারতচন্দ্রের মন ছিল যথার্থ শিল্পীর, তাই তাঁর কাব্যে বাস্তব জীবনের কোনো দুঃখের ছায়া পড়েনি, যদিও তাঁর জীবনের

অধিকাংশ ঘটনার সঙ্গে ভাগ্যবিড়ম্বনার দুঃখময় ইতিহাস জড়িয়ে ছিল। ভারতচন্দ্রকে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 'শিল্পী' বলতেই হয়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের রসবিচার নিয়ে প্রমথ চৌধুরী চমৎকার আলোচনা করেছেন। পরের মুখে ঝাল খাওয়া যে তাঁর স্বভাব ছিল না, তার প্রমাণ এখানে সুপরিস্ফুট। ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ আছে এবং প্রমথ চৌধুরীর পূর্বপর্যন্ত প্রায় সকলেই একবাক্যে ভারতচন্দ্রকে অশ্লীল বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি?' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ২১৯)

প্রমথ চৌধুরী বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের কথা বলেছেন। আমরা প্রমথ চৌধুরীর কথার সাথে একাত্ম হয়ে বলতে পারি ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার মধ্যেও একটি আর্ট আছে, যা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অশ্লীল অংশের মধ্যে নেই। তার কারণ প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য'। (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ২১৯) এ প্রবন্ধ সম্পর্কে সমালোচক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করেননি– কারণ, ভারতচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনার নানা দিক আছে। কিন্তু তিনি কয়েকটি এমন প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন, যা ভারতচন্দ্র-আলোচনার নতুন দিক নির্ণয় করবে। তাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী আলোচনাগুলোর পাশে এই আলোচনাটি একান্ত মৌলিক ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রকে যে তিনি হৃদয়-মন দিয়ে গভীরভাবে বুঝেছিলেন এবং কত অন্তরঙ্গভাবে, তার প্রমাণ এই প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির কোথায়ও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু তার জন্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির তারতম্য ঘটেনি। এখানেও নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু মূল কথাটিকে প্রয়োজনমতো ঠিকই ধরেছেন, কথাসূত্র হারায়নি। এ যেন অন্তরঙ্গ মহলে লঘু ভঙ্গিতে নিতান্ত গল্পচ্ছলে নিজের একান্ত আপন একটি মানুষের কথা বলে যাওয়া। (রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৬৯ : ১৬৭) 'রামমোহন রায়' একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও অসাধারণ প্রবন্ধ। এখানে এককালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মনীষীকে স্মরণ করা হয়েছে অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির মাধ্যমে। তিনি অকারণ ভাববিলাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। বিরুদ্ধবাদীদের মতামত উজ্জ্বল কঠিন যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত করে রামমোহন-চরিত ও তাঁর কার্যকলাপের যথার্থ স্বরূপ কী, তা-ই দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। ফলে রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কার্যকলাপের একটি চিত্রও আলোচ্য প্রবন্ধটি। রামমোহন রায় সম্পর্কে লোকচলিত ধারণাগুলো তুলে ধরা হয়েছে এভাবে, 'রামমোহন রায় যে বাংলার, শুধু বাংলার নয়, বর্তমান ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, এ সত্য বাঙালি কি উপায়ে আবিষ্কার করলে? রামমোহন রায়ের লেখার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে এমন লোক আমার পরিচিতের মধ্যে একান্ত বিরল, অথচ এদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে যথোচিত সুশিক্ষিত এবং দস্তুরমত স্বদেশভক্ত। লোক সমাজে অনেকেরই বিশ্বাস যে, রামমোহন রায় বাংলা

গদ্যের সৃষ্টি করেছেন। তিনি বাংলার সর্বপ্রথম গদ্যলেখক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তা এই যে, তিনি হচ্ছেন বাংলা গদ্যের প্রথম লেখকদের মধ্যে সর্বপ্রধান লেখক।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১৫৪)

প্রবন্ধটিতে রামমোহন রায় সম্বন্ধে একটি লৌকিক ধারণা বদলাবার চেষ্টা হয়েছে। চিরাচরিত ধারণা এই যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রসাদেই রামমোহনের মনোজগৎ গড়ে উঠেছিল। আসলে তা নয়, বরং একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, ইংরেজি শেখার বহু আগে থেকেই তাঁর মনে বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হয়েছিল; তার আগেই তিনি যুক্তির সাহায্যে ধর্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি যেমন পৌত্তলিকতাকে সমর্থন করেননি, তেমনি খ্রিষ্টধর্মকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর মনের প্রবল শক্তি ছিল, যা কোনো সাময়িক উন্মাদনায় আন্দোলিত হতো না। দৃঢ়নিষ্ঠ বিচারবুদ্ধি দিয়েই তিনি সবকিছু গ্রহণ-বর্জন করেছেন। সাময়িক উত্তেজনার স্রোতে অবাধে গা ভাসিয়ে দেননি। তিনি রামমোহন রায়ের মানসপ্রকৃতি নির্ণয় করা হয়েছে এভাবে– 'পৃথিবীতে যে সকল লোকের মতামতের কোনো মূল্য আছে তাঁদের সকল মতামতের মধ্যে একটা সংগতি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, কেননা তাঁদের নানা বিষয়ে নানা জাতীয় মতের মূলে আছে একটি বিশেষ মানসপ্রকৃতি। রাজা রামমোহন রায় কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক, যে কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন সে-সকলের ভিতর দিয়ে তাঁর অসামান্য স্বাধীনতাপ্রিয়তা সদর্পে ফুটে বেরিয়েছে। তিনি যে বেদান্তের এত ভক্ত তার কারণ, ও শাস্ত্র হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র। যে জ্ঞানের লক্ষ্য মুক্তি, ফল মুক্তি, সেই জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার উপদেশ তিনি চিরজীবন স্বজাতিকে দিয়েছেন।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১৬৩-১৬৪)

আমরা দেখি প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের বিস্তর তফাত রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধের অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়ের আপেক্ষিক ক্ষীণতা থাকলেও আলোচ্য প্রবন্ধটির বিষয়ের গুরুত্ব কম নয় আর লেখকের মনটিও বিষয়ের ওপরে নিবদ্ধ। 'দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন, বিতর্কসঙ্কুল আবহাওয়ার সৃষ্টি প্রভৃতি যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রমথ চৌধুরীর গদ্য রচনায় চোখে পড়ে, তা এখানে নেই বললেই হয়। খাঁটি প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়, এ প্রবন্ধটি তাই। বক্তব্য গভীর অথচ খুব হাল্কা চালে বলেছেন, এ কথাও ঠিক বলা চলবে না। তিনি সমগ্রভাবে রামমোহন চরিত্র আলোচনা করলেও, প্রধানত তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টির দিকেই জোর দিয়েছেন। রামমোহনের প্রগতিপন্থী ও অগ্রগামী ভাবনা কেমন করে নবযুগের সূচনা করেছিল সে দিকের ছবিই বড় করে ফুটিয়ে তুলেছেন।' (রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৬৯ : ১৭০-১৭১)

'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধটির বিষয় একটি সাময়িক ঘটনা। সে সময় রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের মতানৈক্য বাংলা সাহিত্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। দুই পক্ষের

সমর্থকেরাও কলম ধরেছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপমূলক রচনার অনেকগুলোরই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও সাহিত্যিক মূল্য নেই। অথচ তিনি সুমিত-ভাষণ, শ্লেষ বক্রোক্তির সতর্ক ও সুকৌশলী প্রয়োগ, উত্তেজনাহীন দীপ্ত পরিমার্জিত ভঙ্গি দিয়ে প্রবন্ধটিকে অসাধারণ করে তুলেছেন। অর্থাৎ প্রমথীয় স্টাইলের একটি পরিচ্ছন্ন রূপ প্রবন্ধটিতে ফুটে উঠেছে।

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'চিত্রাঙ্গদা' নানা কারণে মূল্যবান। তিনি এই প্রবন্ধ লেখার কারণ বলেছেন– টমসন সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মূলত সে কারণেই নতুন করে 'চিত্রাঙ্গদা'র রস-বিচার করতে বসেছেন। দেখা যায় 'চিত্রাঙ্গদা'র রসমূল্য বিচার করতে গিয়ে তিনি রোমান্টিক সৃজন-প্রক্রিয়ার স্বরূপের কথা বলেছেন। অযথা বাগ্‌বিস্তার না করে সূত্রাকারে তাঁর হৃদয়ের অভিপ্রায়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মনিপুরের রাজকন্যা নন, সর্বকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল ও শক্তি।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১৯৬)

এখানে চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া অনুপ্রাস ও উপমার সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ আছে। 'চিত্রাঙ্গদা' যৌবন স্বপ্নের কাব্য। উপমা, অলংকার এখানে বাইরের বৈচিত্র্যবৃদ্ধির জন্য আসেনি– কাব্যের অন্তরাত্মার সার্থক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এসেছে। প্রমথ চৌধুরীর এ প্রবন্ধে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসবোধের একটি মূল্যবান পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

'কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত' প্রবন্ধটিকে বিষয়ানুসারে 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধটির পরিপূরক বলা যায়। 'চিত্রাঙ্গদা' আলোচনায় প্রাচীন আলংকারিকদের মতকে তিনি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য প্রাচীন আলংকারিকদের মতে কাব্যে অশ্লীলতা বলতে কী বোঝায়, তা-ই এখানে বিচার করা হয়েছে। অশ্লীলতা যে কাব্যের দোষ, এ কথা আলংকারিকেরাও স্বীকার করেছেন। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ একটি প্রাচীন গ্রন্থ, সেখানে তিনি অশ্লীল বলতে বুঝিয়েছেন গ্রাম্যতা। গ্রাম্যতা শ্রেষ্ঠ রসের প্রতিবন্ধক। এখানে শব্দগত ও অর্থগত দুই জাতীয় গ্রাম্যতা আছে। আসলে গ্রাম্যতা হচ্ছে শুধু শব্দের দোষ। সুতরাং একটি বাক্য অশ্লীল না হয়েও গ্রাম্য হতে পারে, অথচ সে শব্দ মোটেই গ্রাম্য নয়, তা দিয়েও অশ্লীল বাক্য রচনা করা সম্ভব। অশ্লীলতার স্বরূপ নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর মত, 'আলংকারিকদের মতে অশ্লীলতা একটি দোষ; কেননা, তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে। কারণ ব্রীড়া জুগুপ্সা প্রভৃত মনোভাব কাব্যের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায়,

একটি বদ সুর লাগালে যেমন রাগের রূপ নষ্ট হয়; কারণ শ্রোতার কানে তা বেসুরা লাগে। একথা বলা বাহুল্য যে, বেসুর তার কানেই শুধু ধরা পড়ে যার কানে ও প্রাণে সুর আছে। অশ্লীলতা কাব্যের দোষ, কেননা তা সামাজিক লোকের রুচিতে বেখাপ্পা ঠেকে। এক্ষেত্রে সামাজিক বলতে আলংকারিকরা বুঝতেন কাব্যরসিক।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ২২৬)

সমসাময়িক সাহিত্যিক বিতর্ক নিয়ে আরেকটি প্রবন্ধ 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি'। সাহিত্যবিচারের একটি মূল সমস্যা প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা ও রবীন্দ্রসাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে বহু পূর্বেই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। সেই বিতর্কের সূত্রধরেই প্রবন্ধটি রচনা। দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসারীরা নতুন নতুন একেকটি সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যকে বারবার আক্রমণ করতে থাকে। রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয়াতুর হয়ে সে সময় বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কলম ধরেছিলেন। আর সেই লেখার জবাব দিতে গিয়ে একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীও তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধটিতে লিখেছেন, 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অর্থ যদি প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তা হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বস্তুতন্ত্রতার অভাবে দর্শন হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। যদি বর্ণনার গুণে কোনো কবির হাতে বেল কুল হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে যে তাঁর বেলকুল ভুল হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাধাকমলবাবু অবশ্য যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থে ও বাক্য ব্যবহার করেন না; কেননা যে কবির হাতে বাংলার মাটি এবং বাংলার জল পরিচ্ছন্ন মূর্তি লাভ করেছে তাঁর কাব্যে যে পূর্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই, একথা কোনো সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশ সুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই, এ কথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৬১)

এ প্রবন্ধ সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, '"বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি" প্রবন্ধটি দুদিক থেকে বিচার্য। প্রথমত, দেখতে হবে প্রতিবাদ প্রবন্ধ হিসেবে প্রবন্ধটি কত দূর পরমত খণ্ডন করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসমালোচনা হিসেবে এর মূল্য নির্ণয় করতে হবে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে রাধাকমলবাবুর বক্তব্য থাকলেও তা যেন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। "আধার" সম্পর্কে তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, তা একেবারেই অস্পষ্ট– তিনি কী বলতে চেয়েছেন, তা-ই ভালো করে বোঝা যায় না। তর্কের ভাষা সব সময়ই স্পষ্ট ও শরবত ঋজু হওয়া প্রয়োজন। আর একটি কথা তিনি বলেছেন, যার নাম "নিত্যবস্তু"। এখানেও তিনি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলতে পারেননি। কিন্তু "যুগধর্ম" বলে তিনি যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। যুগধর্ম সাহিত্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত হওয়া সাহিত্যের চরম

সাধনা না হতে পারে। কিন্তু "যুগধর্ম" বলে যে একটি বিশিষ্ট কাল-লক্ষণ আছে, তাকে বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। এর সপক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের একটি যুক্তি আছে। যেহেতু একই যুগে পরস্পরবিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায় সেই জন্য উক্ত ধর্মটিকে অস্বীকার করেছেন। পরস্পরবিরোধী মতামত যেকোনো চলমান কালেরই ধর্ম। এই বিরোধ না থাকলে বোধ হয় কালের অগ্রগতি সম্ভব হতো না। বিশেষত, আধুনিক কালের জটিল সমস্যায় ও ধর্মে যেখানে নানামুখী বৈচিত্র্য, সেখানে পরস্পরবিরোধী মতামত থাকা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি কালের একটি মৌলিক অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। তা না হলে দেশ-কাল যে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে, তা নির্ণয়ের মানদণ্ড কী? সুতরাং পরস্পরবিরোধী মতামত সত্ত্বেও কালের নিজস্ব একটি স্বরূপ ধর্মকে অস্বীকার করা যায় না।...প্রমথ চৌধুরীর প্রতিবাদের ভাষা তীব্র ও মর্মভেদী কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব দিতে গিয়ে কোথাও তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্য হারাননি। বিভিন্ন মসিযুদ্ধে তাঁর সে বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে, তা আলোচ্য প্রবন্ধেও অনুপস্থিত নয়। তাঁর আঘাত অব্যর্থ হয়েও অলক্ষিত– একটি অপ্রত্যাশিত দিক থেকে এমনভাবে আঘাতটি আসে, যার জন্য হয়তো কেউ প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিতে তাঁর সাহিত্যিক মতামতের পরিচয়ও পাওয়া যায়।' (রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৬৯ : ১৮৮-১৮৯)

ফরাসি সাহিত্যের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর কতটা দুর্বলতা ছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' নামক প্রবন্ধটি। এটি ছাড়াও তাঁর অনেক লেখায় ফরাসি সাহিত্যের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে দুটি দিক পাওয়া যায়। একদিকে যেমন স্বল্প পরিসরের মধ্যে সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মেজাজ-মর্জির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি ফরাসি সাহিত্যে রসিক প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতি ও মানসপ্রকৃতির একটি সুন্দর ছবিও এখানে ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া সম্পূর্ণ বিদেশি সাহিত্য ও সভ্যতার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী অদ্ভুত একটি ঐক্য অনুভব করেছিলেন। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ফরাসি দেশের মর্মবেদনা তিনি নিজের মর্ম দিয়ে অনুভব করেছিলেন এভাবে, 'যিনিই ফরাসি সাহিত্য ভালোবাসেন তিনিই ফরাসি জাতির সুখের সুখী ব্যথার ব্যথী হয়ে ওঠেন। আজকের দিনে ফ্রান্স তার জাতীয় জীবনের অণুপরমাণুতে যে অত্যাচারের বেদনা অনুভব করছে আমরাও তার অংশীদার। জার্মানির দেহবলের নিকট ফ্রান্সের আত্মবল, জার্মানির যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়, যদি এই যুদ্ধে ফরাসি সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ইউরোপের মনোজগতের আলো নিবে যাবে।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১০৯)

প্রবন্ধটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো এর শেষার্ধ। কারণ, এই অংশে প্রবন্ধকার ফরাসি ভাষার ক্ল্যাসিক্যাল রীতি ও অন্যান্য শিল্পগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফরাসি ভাষার গঠনের মূলেই এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল, যা এর

গতিপথকে সুনিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। ফরাসি ভাষা লাতিন ভাষার প্রাকৃত– ইংরেজি ভাষার মতো মিশ্র উপাদানে এ ভাষা গড়ে ওঠেনি। এখানে সংক্ষেপে একাদশ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ফরাসি সাহিত্যের ধারাবাহিক কাহিনি বলা আছে। কিন্তু একে শুষ্ক তথ্যবিবৃতি বা ইতিহাস বলা সংগত হবে না। সাহিত্যের ইতিহাসের মতো জটিল ও তথ্যাশ্রয়ী বিষয়কে লেখক কত সহজে ও সংক্ষেপে রমণীয় করে বলতে পারেন, সেটাই দেখানো হয়েছে। প্রবন্ধটির শেষাংশে লেখক আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে ফরাসি সাহিত্যচর্চার প্রসারতা প্রত্যাশা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব গীতিকবিতা যেমন ছিল, তেমনি তার পাশে ছিল মঙ্গলকাব্য। প্রমথ চৌধুরীর মতে, ইংরেজি সাহিত্য শিক্ষার ফলে যেমন আমাদের সাহিত্যে সুফল ফলেছে, তেমনি কুফলও কম হয়নি। তিনি মনে করেন, ভাষাগত সংযম অভ্যাসের জন্য ফরাসি সাহিত্যের অনুশীলন দরকার। মূলত রোমান্টিক ইংরেজি সাহিত্যচর্চার ফলে মনের একটি দিক অনেক বড় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদিকে তেমন পুষ্ট হতে পারেনি। এই কারণে ফরাসি সাহিত্যচর্চার আরও বেশি প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরীর মতে, ইংরেজি ভাষার অতিচর্চার ফলে, তাদের স্থূল অনুকরণ করেই আমাদের এই দুর্দশা। তিনি মনে করেন, ভারতচন্দ্রের বাগ্বিধি ও ভাষাচর্যাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি এবং তা তিনি এভাবেই বলেন, 'ফরাসি সাহিত্য আমাদের এই যন্ত্রকে লঘু করতে, তীক্ষ্ণ করতে শেখায়। এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা, আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলত এক, এবং বিদেশী শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ জার্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তা হলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাস্টারপিস্ বলে গণ্য হত।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ১২৩- ১২৪)

'সনেট কেন চতুর্দশপদী' কবিতার আঙ্গিকসম্পর্কিত প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেন যে আলোচনা করেন, সেই প্রসঙ্গেই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। প্রবন্ধটি সনেটের 'চতুর্দশী তত্ত্ব'-সম্পর্কিত। এখানে তিনি সনেটের কোনো তত্ত্বগত আলোচনা করেননি। প্রবন্ধটি সাধারণ বুদ্ধি ও সনেট রচয়িতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই লেখা হয়েছে।

বীরবলের খেয়ালি মনের লীলাবিলাসই যেন 'নোবেল প্রাইজ' প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে যে তুমুল আন্দোলন ও প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকেই উদ্দেশ্য করে প্রমথ চৌধুরী অম্ল-মধুর টিপ্পনী কেটেছেন এ প্রবন্ধে। সুইডিস অ্যাকাডেমির সম্মুখে যাতে উপস্থিত করা যায়, এই ভেবে অনেক লেখক নিজেদের লেখা তরজমা করানোর দিকেও

সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে বাঙালি লেখকদের প্রাণান্ত অবস্থা ও অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির বিড়ম্বনার কৌতুকছবি তিনি এঁকেছেন।

'সাহিত্যের খেলা' বীরবলী গদ্যরচনার আর একটি সার্থক উদাহরণ। এই সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনাটি যদিও সাহিত্য সম্পর্কেই লেখা, তবু এর লঘুছন্দ ও বাক্‌ভঙ্গিতে বীরবলী ঢঙের সব কটি বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। এ প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান কথাও আছে, কিন্তু বলেছেন রসের ছলে। এখানে সাহিত্যের মাধ্যমে মনোরঞ্জন করতে বসে যেমন নট-বিটের দলভুক্ত হতে রাজি নন, তেমনি গুরুগিরি করাও তাঁর অভিপ্রেত নয়, আবার 'খেলাচ্ছলে শিক্ষা' দেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী নন, কারণ 'সরস্বতীকে তা হলে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে' পরিণত করা হবে, এতে তাঁর প্রবল আপত্তি। যেমন, 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক– এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৯৭)

'শিশু সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী শিশুসাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। প্রবন্ধটির প্রথমাংশে আমাদের দেশে অকালবার্ধক্য সম্পর্কে কৌতুককর আলোচনা করেছেন। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় যে এই কৌতুকের নেপথ্যে আছে বিদ্রূপাত্মক জীবন-সমালোচনা। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অকালবার্ধক্য ও জড়তার বিরোধী। কারণ, এ দুটি বস্তু হলো জীবন-যৌবনবিধ্বংসী। তাই তিনি শুষ্কপত্রের দেশকে সবুজপত্র-মণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। সমাজদেহে ও জীবনাচরণে তিনি তারুণ্য সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। এ প্রবন্ধ নিয়ে রথীন্দ্রনাথ রায়ের মত বেশ প্রণিধানযোগ্য, 'তবে শিশু-সাহিত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও তিনি বাল্যপাঠ্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নি কারণ শিক্ষার মধ্যে যে আনন্দাংশ বাদ পড়ে তা এই জাতীয় সাহিত্য দিতে পারে। শিশু-সাহিত্য বলে কোন বস্তু গোড়ায় ছিল না– যা শিশু সাহিত্য বলে চলে, তা লেখা হয়েছিল বড়দের জন্যই। শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি খুব সামান্যই বলেছেন, কিন্তু সেটুকুর মধ্যেই তাঁর অসামান্যতা ও মৌলিকতা ঝলমল করে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর এ শ্রেণীর লেখায় কোন তথ্য নেই এ কথা বলা সঙ্গত নয়, কিন্তু যে কোন রকম তথ্যকেই যে তিনি রসে পরিণত করতে পারতেন, এ কথা তাঁর বহু লেখায় প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী, তাই যে কোন বিষয়কেই তাঁর মনের তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলো নূতন করে আবিষ্কার করেছে।' (রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৬৯ : ১৯৮)

'মলাট সমালোচনা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সে সময় সাহিত্যসমালোচনার নামে অতিনিন্দা ও অতিপ্রশংসার মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা, অচল সাহিত্যকে প্রাণপণে সচল করার জন্য অতিবিজ্ঞাপিত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা হয়েছে। তা ছাড়া সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে নিরঙ্কুশতা, পুস্তকের নামকরণ সম্পর্কে অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি সাহিত্য প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনাও এখানে আছে। তাঁর রচনারীতির ঔজ্জ্বল্য ও ঋজুতা রচনাটির সর্বত্র পরিস্ফুট। এখানে তাঁর চিরপরিচিতি ঢিলেঢালা মেজাজে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছুটে চলার বিলাস, কথাকে ঘুরিয়ে শ্লেষের মসৃণতা সৃষ্টি করা, তীক্ষ্ণাগ্র ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য রচনাটিকে অন্য এক মাত্রা দান করেছে। প্রবন্ধটির শেষের দিকে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য যেমন ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠেছে, তেমনি হয়েছে ঋজু ও ধারালো। যেমন, 'ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে এবং ভাষায় মাধুর্যের ভান এবং ভঙ্গি। বঙ্গ সাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা। আমরা এতটাই কোমলের ভক্ত হয়ে পড়েছি যে, শুদ্ধ স্বরকেও কোমল করতে গিয়ে বিকৃত করতে আমরা তিলমাত্র দ্বিধা করিনে। কথায় বলে, 'যত চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে।' কিন্তু শর্করার ভাগ অতিরিক্ত হলে মিষ্টান্নও যখন অখাদ্য হয়ে ওঠে তখন ঐ পদ্ধতিতে রচিত সাহিত্যও যে অরুচিকর হয়ে উঠবে, তাতে আর সন্দেহ কি। লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন তা হলে বঙ্গ সাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে। ভাষা যদি প্রসন্ন হয়, তা হলে তার কর্কশতাও সহ্য হয়। এ এতই সোজা কথা যে, এও যে আবার লোককে বোঝাতে হয়, এই মহা আপসোসের বিষয়। যখন বঙ্গ সাহিত্যে অন্ধকার আর বিরাজ করবে না তখন এ বিষয়ে আর কারো মনোযোগ আকর্ষণ করবার দরকারও হবে না।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৪৫১)

'বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে নতুন লেখকদের জন্য পথনির্দেশ করা হয়েছে। প্রবন্ধকার বলতে চেয়েছেন যে বর্তমানকালে সংখ্যালঘিষ্ঠ দিকপালরা নেই বটে, কিন্তু সাহিত্যিকদের সংখ্যা বেড়েছে। প্রমথ চৌধুরী এখানে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা দিয়ে নবযুগের সাহিত্যকে হেয়প্রতিপন্ন করেননি, বরং তিনি এ যুগের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে উৎসাহিতই করেছেন। প্রবন্ধের শেষ দিকে নবযুগের সচিত্র মাসিক পত্রের চিত্র সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লক্ষ করা যায়। ছবির লোভ দেখিয়ে অনেক ক্ষেত্রে খারাপ জিনিসকে বাজারে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও লেখক বলেছেন যে চিত্রসমালোচনা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তথাপি প্রবন্ধের শেষ দিকে চিত্র সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তার মূল্য অনস্বীকার্য। এ ছাড়া প্রবন্ধটিতে তিনি আমাদের শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে যে

কৌতুককর অসংগতি আছে, তা স্পষ্ট করেছেন। তিনি শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন, 'আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চিত্রসন্নাথ হয়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্রকলার বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আমার ও প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অপর একটি কারণ হচ্ছে এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে যা চিত্রকলায় দোষ বলে গণ্য তাই আবার আজকাল এদেশে কাব্যকলায় গুণবলে মান্য।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৪৫১)

'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রমথ চৌধুরী সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লেখা। সমকালীন সাহিত্য-বিচারের মধ্যে যে সমস্ত বিচার-বিভ্রান্তি দেখা যায়, তার কথা তিনি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অথচ গভীর বক্তব্য আছে। প্রবন্ধকার বর্তমান সাহিত্যের অনেক দোষত্রুটি দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও একালের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রত্যাশার অভাব নেই। অন্যদিকে সমসাময়িক সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচকদের মতামতগুলোও খুব ভালোভাবেই বিচারযোগ্য। এ ছাড়া প্রমথ চৌধুরী বর্তমান যুগে মহাকাব্যের বিলুপ্তি, কথাসাহিত্যের প্রাদুর্ভাব, ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের সাফল্যের তারতম্য ও তার কারণ সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন, তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে স্পষ্ট কণ্ঠে যুক্তি আছে কিন্তু উষ্মা নেই; বির্তক ও প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু কখনো মেজাজ হারাননি। তাঁর প্রবন্ধে বিতর্কমূলক আলোচনায় শ্লেষ, বিদ্রূপ এমনকি তির্যক কটাক্ষও আছে কিন্তু বলার ধরনে রয়েছে সংযত ও সুভদ্র ভাব-গাম্ভীর্য। বক্তব্যে আবেগের আতিশয্য থাকলেও পরিচ্ছন্ন। প্রবন্ধ রচনাতে তিনি কথকের রীতিকেই বেছে নিয়েছেন, কারণ ওই রীতির সঙ্গেই তাঁর মানসিকতার যোগ। বিষয় যত দুরূহই হোক না কেন, তিনি সোজা গল্প করেই তা অক্লেশে বলে যেতে পারেন। তাই 'রায়তের কথা' সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় রায়তের কথা এভাবে ফুটে উঠেছে, 'বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান স্রেফ জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয়, তা হলে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানবজমিন; আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই, তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এ দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আগামী ইলেক্শনের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। যার উদ্দেশ্য হবে বাংলার

কৃষকের ওরফে বাঙালি জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্র জাতির দুরবস্থা দূর করা যে কত কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই, একথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে, কেননা সে চেষ্টার ফল ভালো না হয়ে যায় না।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৩৭৮)

প্রমথ চৌধুরী তাঁর একটি প্রবন্ধে তাঁর প্রবন্ধাবলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি এ-জাতীয় লেখার নাম দিয়েছেন 'খেয়াল খাতা'। এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'খেয়ালী লেখা বড়ো দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়োই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা করে তা আয়াসসাধ্য; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃউচ্ছ্বসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগুণে হয়। যা আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি। এ জগৎসৃষ্টি ভগবানের লীলা বলেই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে গড়া জিনিস কষ্টসাধ্য বলেই এত সংকীর্ণ। তবে আমাদের সকলেই মনে বিনা ইচ্ছাতেও যে নানাপ্রকার ভাবনাচিন্তার উদয় হয়, এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু সে ভাবনাচিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা স্পষ্ট সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়; কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অন্যে পারে দূরের কথা, আমরা নিজেরাই তার খেই খুঁজে পাই নে। যা নিজে ধরতে পারি নে তা অন্যের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব; যে ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারি নে, তাকে খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল অনির্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সুস্পষ্ট সুসম্বদ্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়। (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৪৪০)

'রূপের কথা' প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী রূপজ্ঞানের অভাব নিয়ে আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু রূপ-বিমুখদের বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। আসলে পোশাক-পরিচ্ছদে, গৃহসজ্জায় কোথাও রূপজ্ঞান পরিস্ফুট নয়। তাঁর মতে, আমাদের এই রূপান্ধতার কারণ আধ্যাত্মিকতার আতিশয্য। রূপজ্ঞানের মূলে আছে ইহলৌকিক চেতনা, আর একদল রূপ-বিরোধী আছেন, যাঁরা রূপচর্চাকে পাপ বলে মনে করেন। যেন একজাতীয় নৈতিক অপরাধ। রূপ জিনিসটিই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যারা এটা অতীন্দ্রিয় মনে করেন, তাদের দ্বারা রূপসাধনা অসম্ভব। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'রূপের চর্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি, অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের কমার্শিয়ালিজ্‌ম্ আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মতো প্রভুত্ব করছে। সত্যকথা এই যে, জাতীয় শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়, মনের দারিদ্র্য। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাশনের বেশভূষা সাজসজ্জা আচার

অনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা, সোনারজলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মতো আমাদের ধনীসমাজেই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নব শিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই করুক, আমাদের রূপকানা করেছে। গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়– ভারতচন্দ্রের এ কথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়। তাতে পৃথিবীর কারো কোনো ক্ষতি হবে না, এমন কি, আমাদেরও নয়।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৪৭৯)

'রূপের কথা' প্রবন্ধ নিয়ে সমালোচক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, "প্রমথ চৌধুরী রূপের কথা" রচনাটির মোটামুটি বক্তব্য নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। এ বিষয়ে তাঁর ধারণাগুলোকে একত্র করে এখানে প্রকাশ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীকে মনন-প্রধান সাহিত্যিক বলা হয়। এ-জাতীয় বিশেষণ প্রয়োগ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসংগত হয়নি, কারণ জীবনব্যাপী তিনি বিচিত্র জ্ঞান আহরণ করেছেন। তবু জ্ঞান মার্গের পথিক বললে, তার সম্বন্ধে সবটুকু বলা হয় না। জ্ঞান যেখানে রূপময় হয়ে ওঠে, নানাবর্ণে বিচিত্রিত হয়ে ওঠে, সেই জগৎকেই তিনি সাধ্য ও কাম্য বলে মনে করেছেন। এই জন্যই তিনি জ্ঞানী হয়েও রসিক হতে পরেছেন, অর্থাৎ তাঁর পক্ষে এ দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। তাঁর মতে, জ্ঞান হচ্ছে আলোর মূল এবং রূপ হচ্ছে আলোর ফুল। মূল থেকে ফুলে তিনি অবলীলাক্রমে যাতায়াত করেছেন। "রূপের কথা" রচনাটিতে তিনি "রূপ"কে নিয়েছেন একটি বৃহত্তর ও প্রশস্ততর অর্থে। সচরাচর রূপজ্ঞানকে আমরা শিল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গেই আলোচনা করে থাকি, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনচর্চার সঙ্গেও যে এই জ্ঞানটি কত গভীরভাবে সংযুক্ত তা-ও তিনি দেখিয়েছেন।' (রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৬৯ : ২০৯-২১০)

'সুরের কথা' প্রবন্ধে সুরের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন প্রমথ চৌধুরী। আর প্রবন্ধের শেষের দিকে দেশি ও বিলেতি সংগীতের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সংগীতের মূল হচ্ছে শ্রুতি। এই শ্রুতির স্বরূপ ও তত্ত্ব নিয়েই আলোচনাটি এগিয়েছে। শব্দ থেকে সুরের কি সুর থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, সে সম্পর্কে শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শনের মতামত কী, তা দেখানো হয়েছে। সংগীতের তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যে প্রবন্ধকারের বহু শাখায়িত অধ্যয়নশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া দেশি ও বিলেতি সংগীতের পার্থক্যও খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। 'দেশি বিলেতি সংগীতের মধ্যে আর-একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আমাদের নেই। এই হারমনি জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বৈ আর কিছুই নয়, অর্থাৎ ও-বস্তু হচ্ছে সংগীতের বর্ণ পরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগের অধিকারে। আমাদের সংগীত এখনো প্রথমভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সংগীতের দ্বিতীয়ভাগের চর্চা করা উচিত কি না, সে বিষয়ে কেউ

মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান যে দ্বিতীয়ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথমভাগ ভুলে যাবেন। তা ভুলুন আর না ভুলুন, তাঁরা যে প্রথমভাগকে আর আমল দেবেন না, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৪৭১)

সবুজ হচ্ছে প্রাণের প্রতীক। এই প্রাণশক্তিরই আহ্বানে রচিত 'সবুজপত্র' প্রবন্ধ। নিত্য বহমান সেই প্রাণলীলার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যকেও সরস করে তোলা হয়েছে। এখানে একটু লক্ষ করলেই লেখকের বিবর্তনপন্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিজ্ঞান-সত্যকে আমাদের জীবন-সম্পর্কিত মনোভাবের ওপর কত সহজে প্রয়োগ করেছেন, তা প্রবন্ধটি পাঠ করলেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

'নতুন ও পুরাতন' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সমাজচিন্তার নানা বৈচিত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে প্রবন্ধটি তিনি বিপিনচন্দ্র পালের একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদস্বরূপ লিখেছিলেন। এ প্রবন্ধটির মধ্যে দুটি দিক আছে– ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। আমাদের সমাজে নতুন ও পুরাতনের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায় তা বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর প্রবন্ধে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি এই দুই পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে, সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। আর পুরাতনকে যেই নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, তখনি নতুন-পুরাতনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। প্রাবন্ধিকের ভাষায় তা স্পষ্ট, 'আমি পূর্বে বলেছি যে, নতুন পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে তো সে সাহিত্যে, সমাজে নয়। আমার বিশ্বাস যদি অন্যরূপ হত, তা হলে আমি বিপিনবাবুর কথার প্রতিবাদ করতুম না। তার কারণ, প্রথমত আমি সমাজসংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী। অতএব এ ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় এবং কোন্‌টি বিগ্রহের এবং কোনটি সন্ধির যুগ তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত, বিপিনবাবুর উদ্‌ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নূতন পুরাতনের জমা খরচ করলে সামাজিক হিসাবে পাওয়া যায় শুধু শূন্য । সুতরাং কি নূতন, কি পুরাতন, কোনো পক্ষই ও-উপায়ে কোনো সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টামাত্রও করবেন না।' (প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮ : ৩৭৫)

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে এই রচনায় তাঁর বিশটি প্রবন্ধ আলোচিত হয়েছে, যা তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। এ আলোচনার সমাপ্তিতে তাঁর প্রবন্ধের ভাষা নিয়ে দু-একটি কথা না বললেই নয়। এটাও স্পষ্ট যে তাঁর প্রবন্ধের ভাষা ভাস্কর্যধর্মী, ঠিক গীতিধর্মী নয়। ভাবাবেগমুক্ত ঋজু-সংহত ও আতিশয্য-বর্জিত। স্পষ্টালোকিত বুদ্ধি-মার্জিত জগতেই তিনি বিচরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সার্বিক মূল্যায়নে তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন, মানুষের অনুভূতির যে একটি জগৎ আছে বুদ্ধির আলোতে যা স্পষ্ট দেখা যায় না, ভাষায় যার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ

সম্ভব নয়, প্রমথবাবু সে কথা ভাল করেই জানতেন। কিন্তু সে জগতের আকর্ষণ প্রমথবাবুর মনে প্রবল ছিল না। অথবা সে আকর্ষণকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। ভাবের বিন্দুমাত্র আতিশয্য যেমন তাঁর লেখায় নেই, কথায় তেমনি কখনও তা প্রকাশ হত না। অতএব, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধের সমৃদ্ধির মূলে রবীন্দ্রনাথের পরে সবচেয়ে বেশী সার্থক ও অনন্য যে নামটি তা হল প্রমথ চৌধুরী।

লেখক পরিচিত : **ড. রওশন আরা** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ, আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

গ্রন্থপঞ্জি

১. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ,(২০০২) প্রমথ চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

২. চৌধুরী, প্রমথ, (১৯৯৮) প্রবন্ধসংগ্রহ, বিশ্বভারতী।

৩. রহমান, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর, (১৯৯৮) প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষা ও গদ্যচিন্তা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৪. রায়, রথীন্দ্রনাথ, (১৯৬৯) বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

নাগরিক সাংবাদিকতা : সাংবাদিকতার মুক্ত দুয়ার

কাজী আলিম-উজ-জামান

সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার, বিশ্লেষণে সাধারণ মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই হচ্ছে সিটিজেন জার্নালিজম বা নাগরিক সাংবাদিকতা। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকই নাগরিক সাংবাদিক। অনলাইনে সাধারণ জনগণের যেকোনো ধরনের সংবাদ পরিবেশনই নাগরিক সাংবাদিকতার মধ্যে পড়ে। তাই অন্যভাবে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা সাংবাদিক পরিচয় ছাড়াই তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কোনো ঘটনা, কোনো বিষয়ে মতামত, তথ, খুদেবার্তা, ভিডিও কিংবা অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বা কোনো গণমাধ্যমে প্রচারই নাগরিক সাংবাদিকতা।

প্রান্তিক সাংবাদিকতা, নেটওয়ার্ক সাংবাদিকতা, ওপেন সোর্স সাংবাদিকতা, অংশগ্রহণমূলক সাংবাদিকতা, বটম আপ সাংবাদিকতা, স্ট্যান্ড অ্যালন সাংবাদিকতা, ডিস্ট্রিবিউটেড সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত এই নাগরিক সাংবাদিকতা। আর নাগরিক সাংবাদিকতার ধরন হতে পারে তাৎক্ষণিক ঘটনা, মানবিক আবেদনময় ফিচার, মন্তব্য, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, ভ্রমণ নিয়ে লেখা, ভিডিও বা অডিও।

অনেকেই সিটিজেন জার্নালিজমকে কমিউনিটি জার্নালিজম বা সিভিক জার্নালিজমের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। উল্লেখ্য, দুটি ক্ষেত্রেই পেশাজীবী সাংবাদিকেরা কাজ করেন। আবার কোলাবরেটিভ জার্নালিজম বা সোশ্যাল জার্নালিজমের ক্ষেত্রে পেশাজীবী ও অপেশাজীবী সাংবাদিকেরা একসঙ্গে কাজ করেন। সাংবাদিকতার এসব ধরন থেকে সিটিজেন জার্নালিজম সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলে সাধারণ কোনো মানুষের মাধ্যমে স্থানীয় খেলার কোনো প্রতিবেদন যেমন নাগরিক সাংবাদিকতার মধ্যে পড়ে, তেমনি কোনো দেশে কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপিত জাতীয় সংবাদমাধ্যমের বাইরে সাধারণ নাগরিকের কোনো প্রতিবেদনও নাগরিক সাংবাদিকতা। এছাড়া এমন কোনো সংবাদ, যা মূল ধারার কোনো

সংবাদমাধ্যমের জন্য অতি নগণ্য বা অতি বড়, আবার এমন কোনো প্রতিবেদন, যা মূলধারার কোনো গণমাধ্যম প্রমাণ ছাড়া প্রতিবেদন করতে পারছে না– এসব ক্ষেত্রেই নাগরিক সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ভেঙে সংবাদ প্রকাশ করতে পারে।

বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে এই নাগরিক সাংবাদিকতার কারণেই দেশের পাশাপাশি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে জানার সুযোগ পেয়েছে মানুষ। সাংবাদিকতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই নাগরিক সাংবাদিকতা। বর্তমানে বহির্বিশ্বের কিছু নাগরিক সাংবাদিকের প্রতিবেদন ও মতামত জনপ্রিয়তায় মূলধারার সাংবাদিকদের প্রতিবেদনকেও ছাড়িয়ে গেছে।

কীভাবে এল নাগরিক সাংবাদিকতা?

নাগরিক সাংবাদিকতার শুরুটা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। অনেকের মতে, ১৯৮৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে মূলধারার সাংবাদিকদের ভিন্ন মতামতের কারণে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। এমন অবস্থায় নির্বাচনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মতামত নিয়েই শুরু হয় নাগরিক সাংবাদিকতা। ওই সময় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে একেকটি প্রকল্পের মতো নাগরিক সাংবাদিকদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমা বিশ্বে ইন্টারনেট সহজলভ্য হয়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে (ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ) কেন্দ্র করে অনেক যোগাযোগমাধ্যমের যাত্রা শুরু হয়।

নাগরিক সাংবাদিকতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিল ১৯৯৯ সাল। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতির বিরোধী বিক্ষোভকারীদের কাছে মূলধারার সংবাদমাধ্যমে প্রচার পাওয়ার একমাত্র পথ ছিল রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। তবে করপোরেট মিডিয়াগুলোতে ৬০ সেকেন্ডের ভিডিওতে রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখানো হলেও বিক্ষোভকারীদের দাবির কথা জানানো হয়নি। ওই ঘটনায় মার্কিনরা ভিন্নধর্মী সংবাদমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবেই বুঝতে পারেন।

১৯৯৯ সালে ওই ঘটনার সময় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক ক্রিস অ্যান্ডারসন ইনডিপেনডেন্ট মিডিয়া নামের একটি যোগাযোগমাধ্যম চালু করেন, যেখানে সাধারণ মানুষের সংবাদ, প্রতিবেদনসহ মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়। এই 'ইন্ডিমিডিয়া'কেই বলা হয় নাগরিক সাংবাদিকতার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। ১৯৯৯ সালের পর স্বাধীন গণমাধ্যমের (ইন্ডিমিডিয়া) যথেষ্ট সাফল্য দেখা যায় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২০০টি শহরে স্বাধীন মিডিয়া কেন্দ্র (আইএমসি) গড়ে ওঠে।

অবশ্য পথচলায় অনেক প্রতিকূলতায়ই পড়েছিল নাগরিক সাংবাদিকতা। এমনকি ২০০৩ সালে এই নাগরিক সাংবাদিকতা অনেকটাই হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে নাগরিক সাংবাদিকতা আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়।

আক্ষরিক অর্থেই নাগরিক সাংবাদিকতার বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ফেসবুক'। খুদেবার্তা আদান-প্রদানের ওয়েবসাইট টুইটারের যাত্রা শুরু হয় ২০০৬ সালে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এই দুটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পৃথিবীব্যাপী মানুষের মধ্যে যোগাযোগের এক অভূতপূর্ব সেতুবন্ধ তৈরি করে।

একইসঙ্গে চ্যাটরুম, মেসেজ বোর্ড ও মোবাইল কম্পিউটার ব্যবহারের কারণে সাধারণ মানুষের মাধ্যমে সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটতে থাকে। এছাড়া নতুন এ ব্যবস্থায় কোনো বিষয়ে ভোট, সম্পাদকীয় এবং মতামত প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সাংবাদিকতায় সম্পাদকীয় এবং মতামত প্রদানের প্রাধান্য বাড়তে থাকে।

২০০৭ সালে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল বাজারে আনে আইফোন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই গুগলের অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক স্মার্টফোনে বাজার ভরে যায়। এই প্রযুক্তি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকে আরও সহজ করে তোলে। আর এমন সহজ ব্যবহার স্বভাবতই মানুষের তথ্য ও সংবাদ জানানোর পথে অভাবনীয় পরিবর্তন আনে। বর্তমানে স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে মুহূর্তেই সংবাদ, ছবি, ভিডিও প্রকাশ করতে পারেন নাগরিক সাংবাদিকেরা। এরই মধ্যে চালু হয়ে গেছে মোবাইল জার্নালিজম বা মোজো। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে আজকাল সিনেমার শুটিং পর্যন্ত হচ্ছে। নাগরিক সাংবাদিকেরা যেমন মোবাইল জার্নালিজম করছেন, তেমনি মূলধারার সাংবাদিকদেরও দেওয়া হচ্ছে মোজো প্রশিক্ষণ।

নাগরিক সাংবাদিকতা কেন?

বিকশিত গণতন্ত্রের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হলো নাগরিক সাংবাদিকতা, যেখানে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ ও প্রকাশের সুযোগ পান। এ ছাড়া কোনো দুর্যোগে মূলধারার সংবাদমাধ্যমের অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি বুঝতে ভূমিকা পালন করে নাগরিক সাংবাদিকতা। ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি, জলাবদ্ধতার সময় আমরা দেখি শহরের কোনো গলি বা গ্রামের কোনো সড়কের পানিতে উপচে পড়ার ছবি ও লেখায় ফেসবুকের পাতা ভরে যায়, এটাই নাগরিক সাংবাদিকতা। মূলধারার পক্ষে কোনোভাবেই এতটা প্রান্ত অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব হয় না।

আবার মূলধারার সংবাদমাধ্যমে অনেক বিষয়ই গুরুত্বহীন বলে প্রকাশের সুযোগ থাকে না, যা নাগরিক সাংবাদিকতায় প্রকাশের সুযোগ থাকে। আর মূলধারার অনেক সংবাদমাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সরকারের প্রভাব থাকলেও নাগরিক সাংবাদিকতা এসব থেকে মুক্ত হতে পারে। এসব দিক বিবেচনা করলে নাগরিক সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

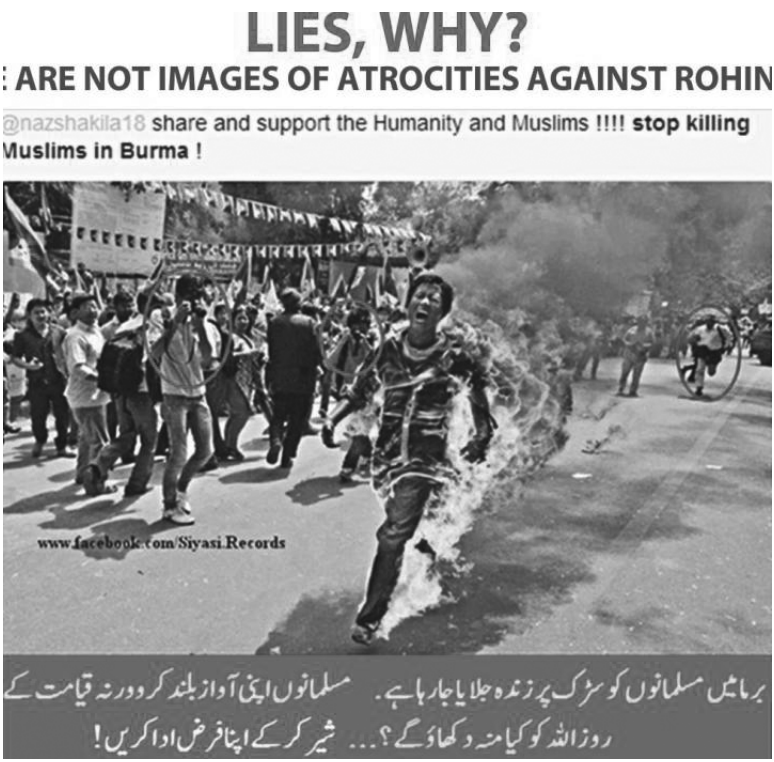

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নিপীরনের অপপ্রচার

নাগরিক সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে একে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকেই সাধারণ মানুষের সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ থাকে। এর মাধ্যমে একজন সচেতন নাগরিক তাঁর জ্ঞান ও সৃজনশীলতা সমাজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারেন।

তবে নাগরিক সাংবাদিকতার কিছু নেতিবাচক বিষয়ও উপস্থাপন করেন অনেকে, যার একটি হলো বিশ্বাসযোগ্যতা। মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো সাধারণত পেশাগত সাংবাদিকদের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্যভাবে সংবাদ উপস্থাপন করে, যদিও কথাটা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু নাগরিক সাংবাদিকদের অনেকেই সংবাদ পরিবেশনের মূলনীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নন। তাই তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে বিভ্রাটের আশঙ্কা থাকে, ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এ ছাড়া উগ্রপন্থীদের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হওয়ারও আশঙ্কা থাকে নাগরিক সাংবাদিকতার। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সে দেশের আরাকান রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর যে নিপীড়ন করেছে, তার ছবি ও ভিডিও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসেছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর এসেছে, এইসব ছবি ও ভিডিও অনেকগুলোই এই ঘটনাকেন্দ্রিক নয়। স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন সাধারণ মানুষ।

বহির্বিশ্বে নাগরিক সাংবাদিকতা?

১৯৬৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি হত্যার ভিডিও ধারণ করেছিলেন আব্রাহাম জ্যঁ প্রুডার। মূলধারার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাঁর এই ভিডিওই পরে অনেক সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়।

১৯৮৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে কাজ করেন নাগরিক সাংবাদিকেরা। তাঁদের অনেক প্রতিবেদন এ সময় জনপ্রিয় হয়।

১৯৯৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সভা নিয়েও নাগরিক সাংবাদিকেরা বেশ সরব ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের কর্মকাণ্ড মূলধারার সংবাদমাধ্যমকে ছাড়িয়ে যায়।

২০০১ সালে ৯/১১-এ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সন্ত্রাসী হামলার অনেক ছবি ও ভিডিও পাওয়া যায়, যা সাধারণ মানুষই তুলেছিলেন। সংবাদমাধ্যমগুলো সাধারণ মানুষের এসব ছবি ও ভিডিও প্রচার করে।

২০০৪ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সুনামি-পরবর্তী ত্রাণ বিতরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সাধারণ জনগণের মাধ্যমে সংগৃহীত সংবাদ। ২০০৫ সালে লন্ডনে বোমা হামলার ঘটনাটি ধারণ করেছিলেন একজন সাধারণ নাগরিক। পরে তা বিবিসি, সিএনএনসহ অনেক প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়।

২০০১ সালে ৯/১১-এ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সন্ত্রাসী হামলার এই ছবি সাধারণ মানুষই তুলেছিলেন। সংবাদ মাধ্যমগুলো এসব ছবি ও ভিডিও প্রচার করে।

একই বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের বড় দুই দল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান, উভয়ের পক্ষ থেকে সিটিজেন ব্লগারদের কনভেনশনের সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানানো হয়, যা নাগরিক সাংবাদিকদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোয় বড় প্রভাব ফেলে। অনেক ব্লগার পেশাজীবী সাংবাদিকদের কার্যকলাপের ওপরও নজর রাখেন এবং তাঁদের কাজে কোনো ভুল হচ্ছে কি না, দেখেন।

২০০৯ সালের জুনে ইরানে নির্বাচনের ফলাফলের বিরুদ্ধে শত শত মানুষ বিক্ষোভ করে। ইরানে সংবাদমাধ্যমের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং এই নির্বাচনের সময় দেশটি থেকে বিদেশি সাংবাদিকদের চলে যেতে বাধ্য করা হয়। তবে খুদে বার্তা আদান-প্রদানের ওয়েবসাইট টুইটার ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাগরিক সাংবাদিকতার কল্যাণে অনেক মানুষই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে। এর ফলে বিক্ষোভ তীব্রতর হয়। তবে এর পরও কোনো রাজনৈতিক সমাধান হয়নি।

২০১০ সালে হাইতিতে ভূমিকম্পে নাগরিক সাংবাদিকতার বেশ কিছু প্রতিবেদন পাওয়া যায়। নাগরিক সাংবাদিকদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

২০১০ সালে আরব বসন্তে বড় ভূমিকা পালন করে নাগরিক সাংবাদিকতা। ওই সময় কয়েকটি আরব দেশের নারী সাইবার-অ্যাক্টিভিস্টদের ওপর করা একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, সাইবার জগতে প্রচারণার কারণে আরব বসন্ত নিয়ে সংবাদ পরিবেশনে বাধ্য হন মূলধারার সাংবাদিকেরা। আর এরই মাধ্যমে নাগরিক সাংবাদিক ও পেশাজীবী সাংবাদিকদের মধ্যেও সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

২০১১ সালে জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদার সাবেক প্রধান বিন লাদেনকে হত্যায় অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে অভিযান চালায় মার্কিন বাহিনী। ঘটনাস্থলের মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে এক নাগরিক সাংবাদিকের খুদে বার্তা থেকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে প্রথম জানা যায়।

একই বছর 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোর অবস্থান নিয়ে অনেক নাগরিকই ছিলেন ক্ষুব্ধ। এসব ক্ষুব্ধ নাগরিকের অনেকে নিজেরাই নাগরিক সাংবাদিকতার মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত তুলে ধরেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নাগরিক সাংবাদিকদের এমন প্রতিবেদন বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় একসময় মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোও এই নিয়ে সংবাদ প্রচারে বাধ্য হয়।

২০১৩ সালে তুরস্কে বিক্ষোভ, ক্রিমিয়া নিয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সংঘাত, পরবর্তী সময়ে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ এবং সম্প্রতি ইউরোপে অভিবাসন-সংকট নিয়ে বিভিন্ন দেশের নাগরিক সাংবাদিকদের করা প্রতিবেদন জনপ্রিয় হয়।

স্বনামধন্য কয়েকজন নাগরিক সাংবাদিক

১৯৬৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে হত্যার ভিডিও করেছিলেন আব্রাহাম জ্যঁ প্রুডার। হোম-মুভি ক্যামেরায় তোলা ওই ভিডিওটিই নাগরিক সাংবাদিকতার প্রথম নিদর্শন বলা যায়। এই হিসেবে আব্রাহম জ্যঁ প্রুডারই নাগরিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ।

মিসরীয় নাগরিক ওয়ায়েল আব্বাস নাগরিক সাংবাদিক হিসেবে সম্প্রতি ডিজিটাল ইজিপ্ট পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর ব্লগ ডিজিটাল ইজিপ্ট এবং তাঁর প্রকাশিত একটি ভিডিও একজন বাসচালককে পেটানোর দায়ে দুই পুলিশকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

অনেক নাগরিক সাংবাদিক ও ব্লগার পরবর্তী সময়ে মূলধারার সংবাদমাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তাঁদেরই একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত পোল্যান্ডের ব্লগার পাওয়েল রোজালিন্সকি।

বিশ্বব্যাপী নাগরিক সাংবাদিকতার বর্তমান পরিস্থিতি

'প্রতিটি নাগরিকই সাংবাদিক' স্লোগান নিয়ে ২০০০ সালে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাধীন সংবাদমাধ্যম 'ওহমাইনিউজ'। বর্তমানে এটি বেশ সফল। সংবাদমাধ্যমটির কর্মীসংখ্যা ৪০, যাঁরা এর ২০ শতাংশ প্রতিবেদন করেন। অবশিষ্ট প্রতিবেদনগুলো আসে ফ্রিল্যান্সারদের কাছ থেকে, যাঁদের অধিকাংশই সাধারণ

নাগরিক। ওহমাইনিউজের প্রদায়কের সংখ্যা ৫০ হাজারের মতো। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করেন তাঁরা।

২০০০ সালে 'দ্য র‍্যাভেন' নামে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেটভিত্তিক উদ্যোক্তা হ্যারল্ড কিওয়াংকা অংশগ্রহণমূলক সাংবাদিকতা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ফ্লোরিডার ডেটোনা বিচ এলাকায় ওয়েব টেলিভিশন চালু করেন। আর ২০০১ সালে অপর অনলাইন সংবাদমাধ্যম 'থিমপার্কইনসাইডার ডটকম' প্রথম নাগরিক সাংবাদিকতাভিত্তিক ওয়েবসাইট হিসেবে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ কিছু পুরস্কার জিতে নেয়।

সম্প্রতি নতুন ধরনের এক সাংবাদিকতা দেখা গেছে, যাকে বলা হচ্ছে হাইপারলোকাল জার্নালিজম। অনেক অনলাইন সংবাদমাধ্যম নির্দিষ্ট এলাকায় থাকা তাদের পাঠকদের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রদানের আহ্বান জানায়। এসব বাসিন্দা এমন সংবাদ জানান, যা মূলধারার সংবাদমাধ্যম ছোট ঘটনা বলে এড়িয়ে যায়।

বেশ কয়েক বছর ধরেই ব্রিটিশ নামী সংবাদমাধ্যম বিবিসি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংবাদের শেষে ঘটনাস্থলের কাছে থাকা ব্যক্তিদের কাছে কোনো তথ্য থাকলে জানানোর আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে। এভাবে সাধারণ জনগণকে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এছাড়া নামকরা অনেক সংবাদমাধ্যমই সিটিজেন জার্নালিজমকে উৎসাহ দিতে ভিত্তি তৈরি করেছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ সংস্থা এএফপি নাগরিক সাংবাদিকদের জন্য সিটিজেনসাইড ডটকম নামে ওয়েবসাইট চালু করেছে। আবার অনেক মূলধারার সংবাদমাধ্যম নাগরিক সাংবাদিকদের উৎসাহ দিতে পুরস্কারও প্রবর্তন করেছে। মার্কিন মূলধারার সংবাদমাধ্যম সিএনএন যেমনটি করেছে, 'সিএনএন আইরিপোর্ট পুরস্কার'।

দ্য টপ টেন নামক তালিকা প্রণয়নকারী ওয়েবসাইটের মতে, বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ ১০ নাগরিক সাংবাদিকতার ওয়েবসাইট হলো, দ্য থার্ড রিপোর্ট, সিএনএন আই রিপোর্ট, গ্লোবাল ভয়েসেস অনলাইন, লোকাল বাই আস, গ্লোবাল রিপোর্ট, টিংগআউট, অলভয়েসেস ডটকম, নুজডেস্ক, নিউজুলু, ৩৬০ নিউজ।

এছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও নাগরিক সাংবাদিকতার ওয়েবসাইটের মধ্যে আছে ভিশনঅনটিভি, নিমবাসনিউজ, ডেমোটিক্স।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের কয়েকটি জনপ্রিয় নাগরিক সাংবাদিকতার ওয়েবসাইটের মধ্যে আছে দ্য ভিউসপেপার, সিজিনেটসওয়ারা, মেরিনিউজ।

কিছু ক্ষেত্রে নাগরিক সাংবাদিকদের প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পেশাজীবী সাংবাদিকেরা। পেশাগত সাংবাদিকদের অনেক বিষয়ই মেনে চলতে হয়

এবং বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন হয়। সেখানে মাঠে কাজ করা নাগরিক সাংবাদিকদের উপকরণ হতে পারে শুধুই একটি ক্যামেরা, যা এখন সাধারণ মুঠোফোনেই থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থানে নাগরিক সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের দ্রুততার কারণে অনেক মূলধারার সংবাদমাধ্যমের পাঠক কমেছে। পাঠক ধরে রাখতে ও আয় বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা শুরু করেছে এমন অনেক সংবাদমাধ্যম।

বাংলাদেশে নাগরিক সাংবাদিকতা?

বাংলাদেশে নাগরিক সাংবাদিকতার সূচনা ঘটেছিল ২০০৫ সালে ব্লগের মাধ্যমে। 'বাঁধ ভাঙার আওয়াজ' শিরোনামে ওই সময় যাত্রা শুরু করে সামহোয়ারইনব্লগ। পরবর্তী সময়ে মুক্তমনাসহ আরও কয়েকটি ব্লগের আবির্ভাব ঘটে, যা অচিরেই তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে প্রথম নাগরিক সাংবাদিকতাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয় মূলধারার গণমাধ্যম বিডিনিউজ২৪ ডটকম। একই সময়ে অপর কয়েকটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমও নাগরিক সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব দেয়। এছাড়া অনেক সংবাদপত্রও জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে নাগরিক সাংবাদিকতা কর্নার চালু করেছে।

ব্লগ ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমে নাগরিক সাংবাদিকতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এতে অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। তবে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় এখানেও সংবাদ প্রকাশে সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা যায়।

বাংলাদেশের অনলাইন সংবাদমাধ্যম বিডিনিউজ২৪ ডটকম ২০১১ সালের বইমেলায় ব্লগ ডট বিডিনিউজ২৪ ডটকম নামে নাগরিক সাংবাদিকতার পোর্টালের যাত্রা শুরু

২০১৪ সালের শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চ, যাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন নাগরিক সাংবাদিকেরা।

করে। ওই সময় বিডিনিউজের পক্ষ থেকে বলা হয়, নাগরিক সাংবাদিকদের সংবাদ ও তথ্য তাদের নিউজ পোর্টালকে আরও প্রাণবন্ত করবে।

বিডিনিউজ ডটকমের নাগরিক সাংবাদিকতা অংশে শুধু লেখাই নয়, ছবি, ভিডিও, অডিও প্রকাশের সুযোগও আছে।

বিডিনিউজ২৪ ডটকমের নাগরিক সাংবাদিকতা পোর্টালের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অনলাইন সংবাদমাধ্যমটির সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদী বলেন, 'এখানে ব্লগাররা শুধুই তাঁদের মতামত দেবেন না, শুধুই অন্য কোনো ঘটনা, কোনো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাবেন না, তাঁরা তথ্যও দেবেন। তাঁরাও একধরনের সাংবাদিকতা করবেন।'

তৌফিক ইমরোজ খালিদী আরও বলেন, 'সাংবাদিকতা নিয়ে কথা বলতে গেলে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়, কমেন্ট ইজ চিপ, ইনফরমেশন ইজ এক্সপেনসিভ। অর্থাৎ মন্তব্য করাটা সহজ, কিন্তু তথ্য জোগাড় করা কিংবা তথ্য দেওয়াটা কঠিন কাজ। প্রযুক্তির কল্যাণে, তথ্য পরিবেশনের কাজটা অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু তথ্য জোগাড়ের যে কাজ, তথ্য যাচাই-বাছাই করার যে কাজ, তা, আমার ধারণা, একটু কঠিন কাজ। কেননা, সেখানে দায়িত্বশীলতার প্রশ্ন এসে যায়, সেখানে সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। এখানে দায়িত্বশীল হতে হবে দুই পক্ষকেই, যাঁরা নাগরিক সাংবাদিক হিসেবে তথ্য দেবেন এবং সেই সাথে যাঁরা এ প্রান্ত থেকে আরেক জোড়া চোখ দিয়ে তা যাচাই করে দেখবেন। একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, দায়িত্বশীল আচরণ করতে ব্যর্থ হলে মাশুল গুনতে হবে সবাইকে। আইন বা বিধিবিধানের বিষয়টি তখনই সামনে আসে, যখন স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা হয়। আমাদের সতর্ক থাকবার প্রয়োজন আছে। ইন্টারনেটে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অসতর্কতার পরিণতিতে সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক মূল্য দিতে হতে পারে।'

বিডিনিউজ ছাড়াও দেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত অনলাইন সংবাদমাধ্যমেই এখন নাগরিক সাংবাদিকতার সুযোগ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাগরিক সাংবাদিকেরা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার চেয়ে ভিন্ন কোনো বিষয়, ফিচার, মতামত ও ভ্রমণভিত্তিক প্রতিবেদন করে থাকেন।

বাংলাদেশে নাগরিক সাংবাদিকতার অবস্থা?

জাতীয় নির্বাচন, সিটি নির্বাচনসহ বিভিন্ন নির্বাচনের অনেক ছবি ও ভিডিও তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েছেন সাধারণ নাগরিকেরা।

২০১৪ সালে শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ সংগঠিত হয়েছে ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন নাগরিক সাংবাদিকেরা।

২০১৪ সালের শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চ, যাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন নাগরিক সাংবাদিকেরা।

২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় মূলধারার সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দাদের দেওয়া অনেক ছবি ও ভিডিও থেকে ঘটনার সময়কার পরিস্থিতির চিত্র মেলে।

একই বছর দেশব্যাপী শিশু নির্যাতনের অনেক ভিডিও এবং ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে যা মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোতে ব্যাপক আলোচিত হয়। এমন অসংখ্য ঘটনার কথা বলা যাবে, যা প্রথম তুলে ধরেছেন নাগরিক সাংবাদিকেরাই।

বর্তমানে বাংলাদেশে অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদ জানার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া নাগরিক সাংবাদিকদের তথ্যের ওপর নির্ভর করেন। কিছু ক্ষেত্রে তারা নাগরিক সাংবাদিকদের তথ্য থেকে সংবাদটি প্রচার করে, পরে নিজেদের অনুসন্ধান থেকে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসির হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে (২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) দেশের মুঠোফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি। আর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটির বেশি। প্রায় সব ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অনলাইন

সংবাদমাধ্যমে ভিডিও শেয়ারিংয়ের সঙ্গে পরিচিত। এই দুটিতেই নাগরিক সাংবাদিকদের অংশগ্রহণের বিস্তর সুযোগ আছে।

কিছুদিন পূর্বেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাগরিকদের দেওয়া তথ্য নিয়ে মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোর উদাসীনতা দেখা যেত। বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টেছে। মূলধারার সংবাদমাধ্যম নাগরিক সাংবাদিকদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই অনেক সময় সংবাদ প্রচার করছে। অনেক সংবাদমাধ্যম ঘটনাস্থলে থাকা সাধারণ মানুষের বক্তব্য ও মতামতকেও গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে।

আর সাধারণ মানুষের চাহিদার কথা চিন্তা করেই মূলধারার জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচারে আরও অংশগ্রহণ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এ জন্য প্রতিনিয়তই বিভিন্ন উৎসাহমূলক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে তারা।

লেখক পরিচিতি : **কাজী আলিম-উজ-জামান**, সহকারী বার্তা সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো।
ই-মেইল : alimkzaman@gmail.com

তথ্যসূত্র : নাগরিক সাংবাদিকতাবিষয়ক বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার ভিত্তিতে রচনাটি তৈরি।

সৈয়দ শামসুল হকের জীবনবোধ ও কাব্যদর্শন
একটি পর্যেষণ

মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

আধুনিক বাংলা কবিতাশিল্পে সৈয়দ শামসুল হক একজন অনন্য শিল্পদ্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যকর্মসমূহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-শিল্পভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা সৃষ্টির মৌল উপকরণ এই দেশ, দেশের মাটি, মানুষ, মানবভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, হাজার বছরের বহমান লোক-উপাদান ও লোক-জীবনভাবনা। সমাজভাবনা, রাজনৈতিক ভাবনা, জাতীয়তাবাদী ভাবনা, নাগরিক

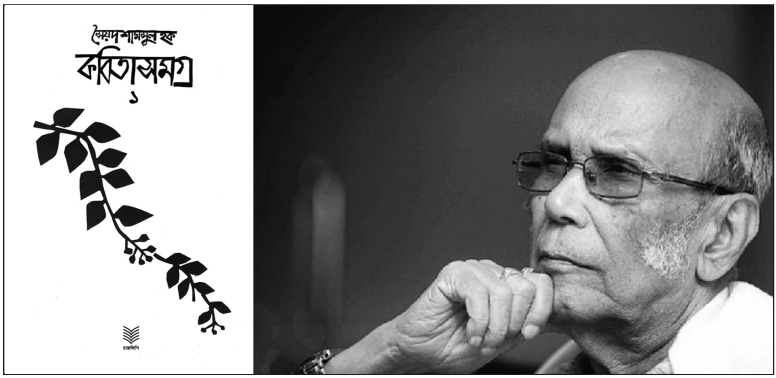

সৈয়দ শামসুল হক ও তাঁর কাব্যসমগ্র-১ এর প্রচ্ছদ

ভাবনা, স্বদেশ-ভাবনাকেন্দ্রিক আরো বহুবিধ অনুষঙ্গ সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যশরীর পরিপুষ্ট করেছে। কবিতা মানবজীবনাভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির শৈল্পিক প্রকাশপদ্ধতি। তাই কবিতার ভেতর আমরা কবিকে খুঁজে পাই। 'মূলত কবি কাব্যে নিজেকেই প্রকাশ করতে চান' (রহমান, ২০০০ : ১৩)। সৈয়দ শামসুল হক কবিতায় নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন নানা সময়ে, নানাভাবে। শুরুটা তাঁর জন্মস্থান কুড়িগ্রাম থেকে। তাঁর স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠে কুড়িগ্রামের সেই ধূলিমাখা মেঠো পথ, বাঁশবন, জারুলগাছ আর

পিতার কবর। সুখ-দুঃখময় শৈশব-স্মৃতিকথার সমন্বয়ে সৃজিত হয় তাঁর কাব্যিক আবহ। কবি বলছেন :

'সেই ধুলো, সেই রাস্তা, বাঁশবন, জারুলের গাছ
আকাশটা ছুঁয়ে আছে ছবির ভঙ্গিতে।
ওখানে অদূরে
নতুন ওলটানো মাটি কাকে যেন দিয়েছে আশ্রয়।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ৩৩)

কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী মাঠ, সেই মাঠের বৃষ্টি আর বুনো চালতা ফল– এগুলো কবিহৃদয়ের প্রেমচেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। তাই তো কবি বলতে পারেন– 'বৃষ্টি এসে ভেজায় কখন নাগেশ্বরীর মাঠ/ দুরন্ত এক বাতাস নাড়ে বুনো চালতা ফল/ হৃদয় যেন'। (হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ২৯)। কবি অপরূপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাঁর স্বদেশভূমির দিকে। এ দেশের অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়ও অসাধারণ সৌন্দর্য হয়ে ধরা পড়ে কবির চোখে এবং তা কবিতার উপাদান হয়ে কাব্যভুবন সমৃদ্ধ করে। কবির কাব্যচেতনার গভীরে প্রোথিত রয়েছে স্বদেশপ্রসঙ্গ। স্বদেশ আর জননী তাঁর কাছে সমান্তরাল। তাই স্বদেশকে তিনি 'জননী' অভিধায় সম্বোধন করতে ভালোবাসেন। স্বদেশবন্দনা তাঁর কবিতাচর্চার মৌল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এ দেশের রূপ-রস-গন্ধে সৈয়দ শামসুল হকের কবিহৃদয় আমোদিত। তার স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যিক প্রকাশব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যচিন্তন-ক্ষমতাকে ঋদ্ধ করেছে। তিনি কবিতায় স্বদেশকে আবিষ্কার করেন নানামাত্রিক প্রশংসাসূচক রূপকল্পে। কবি বলছেন–

'জননী, শ্যামল তুমি বুকে দোলে রুপোর হাঁসুলি–
রাতের আকাশে যেন চাঁদ খেলা করে;
তোমার প্রশংসা করে আমি আজ লিখব এ গাথা।
তোমার সে চাঁদ দেখে ঘুমায় বাংলার গ্রাম, ঘুমে স্বপ্ন আসে–
নিমগ্ন আঙুলে তুমি সারা রাত সেই যে এঁকেছ
সাহসী পুত্রের ঘোড়া, হাতিশাল, সোনালি গম্বুজ, সুখ, ধবল প্রাসাদ।
সৌভাগ্য আমার, আমি দেখেছি এ সব।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ৫৫)

সৈয়দ হকের কবিতায় নৌকা, নদী, নদীবিধৌত পলিমাটি তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যপ্রতীকে উপস্থাপিত। নদীকে কেন্দ্র করে নদীপাড়ে এ দেশের অনেক জনবসতি গড়ে উঠেছে। এখানকার জনগোষ্ঠী এ নদীতেই পালতোলা নৌকা ভাসায়। 'বাংলার নদীসকল ভরে উঠেছে পালতোলা নৌকোর পর নৌকোয় আপনারই প্রতিশ্রুতি বাতাসে'। (হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৮ : ৩৯)। নদী ছাড়া সমতল ভূমিও আছে। এ সমতল ভূমি বর্ষার জলে পালিমাটি দ্বারা সিঞ্চিত হয়; ভূমি শস্যভারে নত হয়। দেশ ও দেশের

প্রকৃতি-প্রতিবেশ সমার্থক ব্যঞ্জনায় কাব্যরসে সিক্ত হয়। কবি নিজেকেও দেশের প্রকৃতি-প্রতিবেশের সঙ্গে একীভূত করে নেন। কবি বলছেন–

'আমিও বাংলার লোক, স্বভাবত বাংলার মতই
সমতল, সংগীতের শস্যভারে নত, দূরগামী
পদ্মার মতই ধীর, পলিমাটি আত্মায় সঞ্চিত।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ১৪৭)

জলের স্পর্শেই বীজ থেকে উঠে আসে ধান; কিন্তু জল না থাকলে, নদী শুকিয়ে গেলে, সৈয়দ হক শঙ্কিত হন। তাঁর মতে বাংলায় তের শ নদী আছে। এ নদীর কিনারে জেগে উঠবে ধান। ধানের গন্ধে ভরে যাবে বাংলার প্রাণ; এ নদীর জলে স্নান করে মানুষ হেঁটে যাবে সংসারের দিকে। সৈয়দ হক বলছেন–

'বাংলার তেরোশত নদীর কিনারে যেন জেগে ওঠে ধান,
সবুজের গন্ধে যেন ভরে যায় বাংলার প্রাণ,
তোমার নির্মল জলে করে নিয়ে স্নান
আবার মানুষ যেন হেঁটে যায় সংসারের দিকে'।
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ৬৬)

দুই.

সৈয়দ হক ইতিহাস ও সময়সচেতন কবি। তিনি কবিতায় সমকালীন সময়কে ধারণ করেন, সেই সঙ্গে অতীতকেও। প্রবহমান সময় তাঁর কবিতায় উপস্থিত। কবি নানা রকম ইঙ্গিতে-প্রতীকে পাঠকসমাজকে ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তুলতে চান। চলমান সময়ের প্রেক্ষাপটে নানামাত্রিক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে কবিতার সম্পর্ক রয়েছে। কবিতার মধ্য দিয়ে কবি পাঠককে অতীতের সঙ্গে সম্পর্কসূত্র নির্মাণে সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসমিশ্রিত কাব্যভাবনাই তাঁর হাতিয়ার। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

'ধর্মপাল, মহিপাল, হোসেন শাহের কাল,
নূরলদীনের কাল, তিতুমীর, হাজী শরিয়ত,
শমসের গাজী, গারো, কৈবর্ত বিদ্রোহের কাল,
নীল বিদ্রোহের কাল,
রক্তলাল ফেব্রুয়ারির পথ হেঁটে হেঁটে
বারবার উত্থানে-পতনে পড়ে যে আমি উত্তাল
মেঘনা যমুনা পদ্মা ঠেলে ঠেলে মধুকরী নৌকোয় একদা
পৌঁছে গেছি রমনার বিশাল উদ্যানে
রৌদ্রজ্বলা দুপুরে সংহত লক্ষ জনসমাবেশে,
যে আমি দেখেছি তাঁর মহামুনি বটের উচ্চতা,

দেখেছি উড্ডীন হতে কণ্ঠ থেকে তাঁর
সোনালী ঈগল শব্দ–
মুক্তি! স্বাধীনতা!
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ৭১)

এটি ইতিহাসচেতনাসম্পৃক্ত একটি অসাধারণ কবিতা। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল, পাল শাসনামল থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, পরাধীন ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কৃষকনেতা নূরলদীনের বিপ্লব থেকে বঙ্গবন্ধুর বিপ্লব পর্যন্ত একটি বিপুল সময় পরিসর এই কবিতার মাধ্যমে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। এই কবিতার প্রতিটি শব্দ একেকটি সুবিশাল কাহিনি ধারণ করছে। যেমন ধর্মপাল, মহিপাল, হোসেন শাহের কাল, নূরলদীনের কাল, তিতুমীর, হাজী শরিয়ত, শমসের গাজী, গারো, কৈবর্ত বিদ্রোহের কাল, নীল বিদ্রোহের কাল, রক্তলাল ফেব্রুয়ারির পথ হেঁটে হেঁটে– এর প্রতিটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কবিতার সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ রয়েছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কবিতা সৃষ্টি হয়। তাই কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কোনো ঐতিহাসিক কাহিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। কবিতা ও কাহিনি দুটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক মজিদ মাহমুদ বলছেন–

'কবিতা কোনো কাহিনী নয়। কবিতা একটি পঙ্‌ক্তি কিংবা কতিপয় পঙ্‌ক্তির সমষ্টি। যার মধ্যে দর্শনের কোনো একটি সূত্র কিংবা প্রতিবেশের খণ্ডিত প্রতিমূর্তি ধরা পড়েছে। তবে কবিতা কাহিনী না হলেও হাজারো কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম। কবিতার শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে কথিত এবং অকথিত গল্পের বীজ। কবি তাঁর শব্দের মধ্যে একটি কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান।'[৮] (মাহমুদ, ২০০৩ : ১০)

সৈয়দ হকের কবিতা কতগুলো সময়ের সমষ্টি। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি চরণ মানবজীবন ও সংশ্লিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কবিতাশিল্পে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার কণ্ঠ চেপে ধরে; তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়। কিন্তু বাঙালি এটি মানতে পারেনি। ফলে ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদভিত্তিক একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সৈয়দ শামসুল হক কবিতাকাঠামোয় আবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলছেন–

'আমার বর্ণমালা, বাঙালির জীবন ও ইতিহাস–
বায়ান্ন, ঊনসত্তর, একাত্তর, নব্বই–
জয় ও পরাজয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম লাল সুতো।
এই সুতোর এপারে এবং ওপারে এখন
আমারই খণ্ডিত দুই অংশ দাঁড়িয়ে–
চূর্ণিত, বিকট, বিধ্বস্ত এবং নত। (হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ১৫১)

তিন.

সৈয়দ হকের কবিতায় পুরাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যিক অনুষঙ্গ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পুরাণ প্রয়োগ-প্রকৌশলে তিনি সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে পৌরাণিক প্রসঙ্গ নতুন করে জীবন লাভ করে। যমুনা নদী শুকিয়ে গেলেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে বাংলা কবিতায় এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। সৈয়দ হক একাধিক কবিতায় রাধার প্রেম, ভরা যমুনার জল– এসব প্রসঙ্গ পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সীতা একটি প্রধান পৌরাণিক নারীচরিত্র। তিনি মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জনক রাজা ভূমি কর্ষণের সময় লাঙলের রেখায় সীতাকে পেয়েছিলেন। তাকে সন্তানের মতোই প্রতিপালন করেছিলেন। হাজার বছরের কিংবদন্তিতুল্য পৌরাণিক এই ঘটনাটি সৈয়দ হক কবিতার জমিনে নতুন রূপকল্পে উপস্থাপন করলেন। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

> ‘ক্ষেতের ভেতর দিয়ে কৃষকের পদচিহ্ন আঁকা পলি-পথ,
> হামা দিচ্ছে শিশুটি সেখানে–এইমাত্র যেন সীতা উঠেছেন
> জনকের লাঙলের ফালে। অদূরেই একটি বালিকা দেখি
> নিষেধ দুচোখে নিয়ে বসে আছে পৃথিবীর সমান বয়সী।
> বালিকা তাকিয়ে আছে শিশুটির দিকে।’
> (হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ১৩৪)

বেহুলা, লখিন্দর, মা সনকা, চাঁদ সওদাগর, সর্পদেবী মনসাকেন্দ্রিক পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে মধ্যযুগের কবিরা মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় এ প্রসঙ্গ নানা ব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ লাভ করেছে। বাসররাতে লখিন্দরকে সর্প দংশন করেছিল। লখিন্দরের শব গাঙুর নদীতে ভেসেছিল। বিবাহ-উৎসব, বাদ্য-বাজনা সব বিষাদে পরিণত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

> ‘এত ভালোবাসা বাদ্য, এত ধুম, বিবাহ উৎসব।
> বেহুলাও নেই, বন্ধু, একা ভাসে লখিন্দর শব।’
> (হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ২৬৭)

চাঁদ সওদাগর ও তার বাণিজ্যের প্রসঙ্গ সর্বজনবিদিত। সে-ও এই বাংলারই বণিক। সমুদ্রের লোনাজল ভেঙে সপ্তডিঙা নিয়ে সে দূরদেশে বাণিজ্যে যেত। সর্পদেবী মনসার সঙ্গে ছিল তার বিরোধ। চাঁদ সওদাগর একে একে সব পুত্র হারিয়েছিল। চাঁদ সওদাগরের পৌরাণিক এই প্রসঙ্গ কবি অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ করে কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। কবি বলছেন–

> ‘কবেকার বণিক সে? ছিল কোন পণ্য তার?
> সমুদ্রের লোনাজল ভেঙে তার সপ্তডিঙা দূর দেশ থেকে

বয়ে আনতো কোন বস্তু যার ছিল প্রয়োজন বাংলার সংসারে?
একে একে সেও তার সব পুত্র হারিয়েছে বিষে।'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ৬৪)

চাঁদ সওদাগর প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলছেন, 'সর্পদেবীর সঙ্গে মানব চাঁদ সওদাগরের যে বিরোধ, তা একদিকে যেমন মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যধারার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবাহী করেছে তেমনি লোকজ বাংলার বিদ্রোহী চাঁদ বেনের দুঃসাহসকেও সংগ্রামের প্রতীক করে তুলেছে।' (হাসান, ২০০৫ : ১৩৩)

প্রাচ্যপুরাণ ছাড়া প্রতীচ্য-পুরাণের আশ্রয়ে তিনি কবিতার ভুবন সাজান। কখনো গ্রিক পৌরাণিক পাখি স্ফিংকস্, কখনো টেলেমেকাস, আবার কখনো ইউলেসিস সৈয়দ হকের কবিতার কাব্যসুষমা সমৃদ্ধ করেছে। ইউলেসিস 'গ্রিক পুরাণের বিখ্যাত বাগ্মী ও বীর, ইথাকার রাজা অডিসিউসের রোমান নাম।' (খান, ১৯৯৬ : ২৭) গ্রিক পৌরাণিক কাহিনিতে দেখা যায় ইউলেসিস (অডিসিউস) সমুদ্রকন্যার গান উপেক্ষা করে, একচক্ষু দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষে বীরের মতো ইথাকায় পৌঁছে যায়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ হক তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতায় বলছেন–

'হে ইউলেসিস, তোমাকেও তো আমি একদিন দেখেছিলাম
সমুদ্রকন্যার গান উপেক্ষা করে পেনেলোপির দিকে মাস্তুলে পাল তুলে
একচক্ষু দানবের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে ইথাকায় পৌঁছতে।'[১৪]
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ২১২ ও ২১৩)

পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রয়োগ-প্রকৌশলে সৈয়দ হকের কবিতা সার্বিকতা লাভ করে। বিশেষ থেকে নির্বিশেষরূপে উপস্থাপন করা– এতে তাঁর কাব্যিক সক্ষমতা ও পরিচর্যার পরিচয় রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য– 'পুরাণ, ইতিহাস, ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছন্দে অবলীলায় উঠে আসে। গ্রহণ করে আলঙ্কারিক মাত্রা। তখন তা শুধু বিশেষ না হয়ে নির্বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছায়। পরিবেশিত হয় সার্বজনীন হয়ে।' (ইকবাল, ২০০৮ : ১৪২)

চার.

মানবজীবনবোধ ও অধিকারসচেতনতা সৈয়দ হকের শিল্পচর্চার অন্বিষ্টবস্তু। তিনি পরাধীন ব্রিটিশ-ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের আলো-বাতাসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আশি বছরের বেশি সময় তিনি জীবনকাল পেয়েছিলেন। ব্রিটিশের শাসন-শোষণ প্রত্যক্ষ করেছেন; '৪৭-এর দেশবিভাজন-পরবর্তী পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ আচরণ, ভাষা আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ; পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট, অতঃপর স্বৈরাচারী

সরকার– ইত্যাকার রাজনৈতিক ঘটনাবলি তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ সময়-পরিসরের জীবনাভিজ্ঞতার নির্যাস কবিতার রূপকল্প বিনির্মাণে অনিবার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। তারা বাংলা ভাষা সংস্কার করতে চায়, আরবি হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা অব্যাহত রাখে, নানা কমিটি গঠন করে, বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদ করতে চায়, রাষ্ট্রভাষারূপে উর্দু প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মূলত তারা বাঙালির কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়। এ জন্য লিপ্ত হয় গভীর ষড়যন্ত্রে। গবেষক রফিকুল ইসলাম বলছেন–

> 'পূর্ববাংলা সরকার ১৯৫১ সালেও বাংলা বর্ণমালা উচ্ছেদের প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে পূর্ববাংলা সরকারের শিক্ষা-দফতর এক সরকারি আদেশ জারি করে। তাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এখন থেকে মুসলমান বালকগণের শিক্ষা আরবি বর্ণমালা দ্বারা আরম্ভ হবে। নতুন ব্যবস্থানুযায়ী শিশুরা ১ম ও ২য় শ্রেণীতে আরবি অক্ষর পরিচয় শিক্ষা করবে এবং ৩য় শ্রেণীতে তাদের আমপারা শিক্ষা দেওয়া হবে। ৪র্থ ও তদূর্ধ্ব শ্রেণীগুলিতে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু পড়ানো হবে।' (ইসলাম, ২০১৩ : ২৫৮)

ঢাকাসহ সারা দেশে দাবানলের মতো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন স্তব্ধ করবার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে খণ্ড খণ্ড মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকেই শহীদ হয়। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কবিদের কলমে মাতৃভাষা নিয়ে উৎসারিত হয় অমর সব পঙ্‌ক্তিমালা। সৈয়দ হকের এ রকমই একটি কবিতা 'আর কত রক্তের দরকার হবে'। এই কবিতায় সৈয়দ হক ৪০ বার 'মা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মাতৃভাষার প্রতি নিবেদিত একটি অনন্য কবিতা। কবি বলছেন–

> 'মা।
> বরকত লিখেছে– মা,
> সালাম লিখেছে– মা,
> জব্বার লিখেছে– মা।
> মতিউর-আসাদ– ওরা লক্ষ লক্ষ লিখে গেছে– মা,
> যাদের নাম আমাদের প্রত্যেকের কণ্ঠনালীতে
> বাষ্পের বিষফল হয়ে গেছে, লিখে গেছে– মা।
> এই একটি শব্দ, এই একটি বীজ, এই একটি মন্ত্র,
> এই একটি আবিষ্কার, এই একটি অধিকার,

বাংলার বিশাল ও আবর্তিত আকাশে এই একটি দীপ্তিকণা–
মা।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ৩০৩)

সৈয়দ হক ভীষণভাবে রাজনীতিসচেতন কবি। জাতীয়তাবাদী চেতনা তাঁর শিল্প সৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তিনি অনেক শিল্পসফল কবিতা লিখেছেন। যেমন 'গেরিলা', 'জন্মদিনের কবিতা', 'একাত্তরের চিঠি : প্রাপক বনলতা সেন', 'যত দিন না লেখা হয় ইতিহাসের নতুন এক পাতা' প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধকালে সমগ্র দেশ পরিণত হয়েছে বিশাল একটি শশ্মানে। সর্বত্রই গণহারে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এমনকি তাদের একসঙ্গে গণকবর দেওয়া হয়েছে। বাংলায় হয়তো আর কোথাও কবর দেওয়ার মতো জায়গা নেই। তাই কবি মহাশূন্যে কবর খনন করতে চেয়েছেন। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

'আবার গুলির শব্দ, আরো মৃত্যু, আরো লাশ, আরো–
ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইলের প্রতি ইঞ্চি কবেই
কবরের অধিকারে চলে গেছে। তবে আকাশেই
কবর খনন করি আমি আজ মহাশূন্যতার।'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ২৩৬)

সৈয়দ হকের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও রাজনীতিসচেতনতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলছেন–

'সৈয়দ শামসুল হক আমাদের স্বাধীনতা, সংগ্রাম, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, জাতীয় চেতনা, রাজনৈতিক ঐতিহ্য, জনপদ ও জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অজস্র কবিতা লিখেছেন। স্বাধীনতার বীজমন্ত্র তাঁর চেতনায় উজ্জ্বল এক উপাদান বরাবরই। আর ইতিহাস থেকে তিনি খুঁজে নিয়েছেন সূত্র। ধারাবাহিক ইতিহাস থেকে বাঙালির জীবনবোধ যেভাবে একটা স্থির বিন্দুতে থিতু হয়েছে, তিনি সেই পথকে গ্রহণ করেছেন।' (আহসান, ২০০৮ : ১০০)

পাঁচ.

সৈয়দ শামসুল হক সমকালীন প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যচিন্তন-ক্ষমতায় স্বযত্নে ধারণ করেন। 'প্রতি কবির কাছে তার কালই তার একান্ত মানসসুন্দরী, নিজস্ব কালের গর্ভ থেকে জন্ম নিতে হয় প্রতিটি কবিকে, এবং তাকে দিয়েই চিরকালকে বন্দী করতে হয় নিজের বাহুবন্ধনে।' (আজাদ, ১৯৯২ : ১২) সৈয়দ হক তাঁর স্বকালকে কাব্যবন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজ ও শিল্পের কাছে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিলেন। মানুষ আশায় বসতি করে। একটি সুদীর্ঘ সময়কালের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই

স্বাধীনতা। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল না। দুর্ভিক্ষ, জাতির পিতা হত্যা, জেল হত্যা, স্বৈরাচারী শাসন, মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর উত্থান– এসব অপ্রত্যাশিত ঘটনায় জাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে গবেষকের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য–

> 'সূচনালগ্ন থেকেই রাজনীতিক সঙ্কট, প্রশাসনিক শৈথিল্য, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সদ্য সমাপ্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অস্বাভাবিক নয় কিন্তু স্বপ্নপ্রবণ জনসাধারণ এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কেউ কেউ নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সহজ পথ হিসেবে খুন-রাহাজানি-ছিনতাইকে বেছে নিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা ও তজ্জনিত ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ মানুষকে দিশেহারা করে তোলে, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক ও অন্যান্যের রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতিকে স্তম্ভিত করে ফেলে, বিহবল করে নভেম্বরের চার জাতীয় নেতার জেল হত্যার অবিশ্বাস্য ঘটনা। ব্যারাক ছেড়ে সামরিক জান্তা রাষ্ট্রের তখতে আসীন হলে সেই হতাশায় নিমজ্জিত জনগণই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।' (হোসাইন, ২০১৩ : ১৬৬)

জনতার সঙ্গে বাংলাদেশের কবিগণও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা কলম হাতে তুলে নেন, লেখেন অমর সব কাব্য-পঙ্‌ক্তিমালা। সৈয়দ শামসুল হক এমনি একজন কাব্যশিল্প-ব্যক্তিত্ব। বঙ্গবন্ধু এমন একজন ব্যক্তিত্ব, ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের মতো ব্যাপ্ত যার বুক। বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে একটি ইতিহাস-আদর্শ, একটি মূল্যবোধকে হত্যা করা হয়েছে। সৈয়দ হকের প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

> 'আমি সাক্ষী। লিখে রেখো এ আমার নাম।
> তেরোশ' বিরাশি সন। মেঘার্ত শ্রাবণ। শেষ রাত।
> অকস্মাৎ! বৃষ্টি নয়, ঘটে গেলো রাষ্ট্রস্বপ্ন থেকে রক্তপাত।
> ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের মতো ব্যাপ্ত ছিল যাঁর বুক–
> বিদ্ধ হলো উত্তপ্ত বুলেটে।
> দেহ শুধু দেহ নয়– ইতিহাস, মূল্যবোধ, শ্রেয়–
> ভেসে গেলো বাংলাদেশ রক্তের প্লাবনে–
> অন্তিম শ্রাবণে।'
> (হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ৭০)

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক জান্তা ক্ষমতায় আরোহণ করে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় আবার মাথা তোলে; প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী সক্রিয় হয়; এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়। এই সময়কাল সম্পর্কে সৈয়দ হক বলছেন– 'একুশটি বছর আমি ক্রমাগত সাঁতার দিয়েছি / মরা নদীতে, আর হেঁটেছি মরা ঘাসে;' (হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ১৯৩) মৌলবাদীদের এক হাতে জপমালা, অন্য হাতে চাপাতি। কবি বলছেন–

'স্বজন এখন ক্রমে নখদন্তসহ বটে পশু
আমাদের বাংলাদেশে। এক হাতে জপমালা যার
তারই অন্য হাতে আজ ঘাতকের ধারালো চাপাতি;
বাগান উৎসন্ন করে সেই পুরাতন রাজাকার–
রাজপথে তরুণের লাশ পড়ে, রক্তে ভেজে মাটি।'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ১৯১)

দেশের এই দুরবস্থায় কবি হতাশ; তিনি স্বদেশকে প্রশ্ন করছেন– 'বাংলাদেশ, কোথায় যাচ্ছ তুমি ধেই ধেই করে / পাছার কাপড় তুলে আঘাটায়' (হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ২৯) এ দেশ রবীন্দ্র-নজরুলের দেশ, এ দেশ আছে জয়নুলের চিত্রে, আব্বাসের গানে, ঢেঁকির শব্দে; এ দেশ তেরশ নদীর দেশ, জারি-সারি-ভাটিয়ালি আর মুর্শিদি গানের অসাম্প্রদায়িক দেশ বাংলাদেশ। সৈয়দ হক আশাবাদী মানুষ। বাংলাদেশকে তার স্বমহিমায় ফিরে আসবার জন্য সৈয়দ হকের একান্ত কাব্যমিনতি নিম্নরূপ–

'ফিরে এসো, বাংলাদেশ,
ফিরে এসো লৌহিত্য নদের কিনারে,
ফিরে এসো মানুষের মিছিলে আবার,
ফিরে এসো যোদ্ধার পেশীতে তুমি,
ফিরে এসো মুজিবের কণ্ঠস্বরে,
রবীন্দ্রনাথের গানে,
নজরুলের আগুনে আবার,
ফিরে এসো, বাংলাদেশ,
আমার বিনতি,
ফিরে এসো লৌহিত্য নদের কিনারে।'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ৩০ ও ৩১)

ছয়.

হাজার বছরের বাঙালির যাপিত জীবনধারা, সংস্কৃতি-সভ্যতা, লোকজীবন ও লোক উপাদান তাঁর কাব্যশিল্পকে শৈল্পিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত করেছে। কবিতায় তিনি ঘুরেফিরে বাংলা ও বাঙালির শিকড় সন্ধান করেছেন; ক্রমাগত বিনির্মাণ করেছেন আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গগুলো। 'মূলত বাঙালি জাতি এবং বাংলা কবিতার শেকড় সন্ধানেই বাংলার লোকায়ত জীবন ও লোকসংস্কৃতির মর্মমূলে তাঁর শিল্পযাত্রা।' (হায়দার, ২০১২ : ৯৫) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক কবি বিশেষত তিরিশের পঞ্চপাণ্ডব ইউরোপীয় ভাবধারায় বাংলা কবিতায় তাঁদের সৃজন ভাণ্ডার সাজিয়েছেন।

কিন্তু সৈয়দ শামসুল হক সে পথে যাননি। তিনি শিকড়সন্ধানী কবি, এ দেশের মাটি ও মানুষের কবি, মৃত্তিকার কবি। এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা, শিক্ষা-সংস্কৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। সেখান থেকেই কবিতাশিল্পের উপাদান আহরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ হক বলছেন– 'কবিতার উপাদান নিতে আমি ইউরোপের কাছে যাইনি।' (হক, *প্রথম আলো*. ২২ সেপ্টেম্বর : ৩) সৈয়দ হকের কবিতা পাঠ করলে এর সত্যতা মেলে। বাংলা সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে তিনি ভবিষ্যতের পথরেখা সৃজন করেছেন; স্মরণ করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

'রবীন্দ্রনাথের গান তুমি ভালোবাস। তাই সম্প্রতি
লেখাপড়া, ঘুম, সংসার, স্বজনের প্রতি
আমার মনোযোগ নেই। নিজের ভীষণ ক্ষতি
হচ্ছে তা হোক;
একে যদি কেউ বলে রোগ
বা পাগলামো, তা বলুক, বাথরুমে আমি শিখছি রবীন্দ্রসঙ্গীত।
কারণ তুমিই তো আমার ভবিষ্যৎ, বর্তমান, অতীত।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ১০৯)

বাংলা ভাষার গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে। এ দেশের অনেক কবি ও কাব্য আছে, চন্দ্রাবতী মধ্যযুগের একজন অন্যতম কবি। প্রণয়োপাখ্যান, গীতিকা, বাঁশি, ব্রহ্মপুত্র নদ, কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ– এগুলোই তো বাঙালির আত্মপরিচয়। কবি বলছেন–

'কে দিলো দয়ায় ছুঁড়ে? কালাপানি খলখল করে।
চন্দ্রাবতী নাম তার? গন্ধ বুঝি কাঁঠালিচাঁপার।
গীতিকা-র পাঠ হচ্ছে, ব্রহ্মপুত্র আজো বহে যায়।
শুনেছি তবে সে বাঁশী করালের এ ঘুমে আমার?'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ১৪২)

রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান মধ্যযুগের কাব্যধারার একটি বিশেষ অনুষঙ্গ। এগুলো তো ভারতবর্ষের লোকজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। প্রেমের টানে মানুষ ঘর ছাড়ে, প্রেমের টানেই বাঁধে ঘর। ফরহাদ কীভাবে মরুভূমির বিরূপ মাটিতে ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছিল– এ প্রসঙ্গগুলো সৈয়দ হক কবিতায় স্মরণ করেছেন। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

'হে ফরহাদ, তোমাকেই তো আমি একদিন দেখেছিলাম মরুভূমির দেশে
দিনের পর দিন কোদাল ধরে খননের পর খনন করে যেতে, আর
বিরূপ মাটির বুকে ঝর্ণার জলধারা ফোটাতে।'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ২১৩)

কবি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরীতে বড় হয়েছেন। তাঁর বাবা পেশায় ডাক্তার ছিলেন। তিনি সাইকেলে চড়ে দূরদূরান্তে রোগী দেখতে যেতেন। এগুলো তো এখন কবির স্মৃতির পাতায় ভিড় করে আছে। বাল্যস্মৃতি সম্পর্কে কবি বলছেন–

'কতদিন দেখি নি আমার স্বপ্নে যেমন তিনি আসতেন
তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় প্রতিদিন
পরনে পাবনার লুঙ্গি
খালি পায়ে ঘুরছেন শবজির বাগানে
ঠিক গোসলের আগে বৈশাখের চোখ পোড়ানো দুপুরে
আবার কখনো দেখতাম
ফিরছেন নাগেশ্বরী থেকে সাইকেল ঠেলে
রোগী দেখে
সঙ্গে কালোজাম'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ১৬৬)

হাজার বছরের চর্যাপদ থেকে অদ্যাবধি লোকসংস্কৃতির অপরূপ কাব্যিক রূপায়ণ সৈয়দ হকের কবিতাকে শোভিত করেছে। কখনো কখনো কবি আঞ্চলিক ভাষার মধ্য দিয়ে অনুভূতিগুলো ধারণ করেছেন। সিঁদুর, হলুদ শাড়ি, পূর্ণিমা, জিগার বৃক্ষ, বাংলার কৃষক– এগুলোকে তিনি কবিতায় ধরে রাখতে চান। প্রাসঙ্গিক কাব্য-উক্তি–

"'সিন্দুর পৈরাছে দ্যাখো সান্‌ঝের আকাশ'
এই বলে বালিকা তখন
হলুদের শাড়িতে জড়িয়ে শরীর
পূর্ণিমার পাখিরূপ নিল
জিগার বৃক্ষের মতো পুরুষের ডালে।
বাংলার কৃষক এক কবি বুঝি হেঁটে যেতেছিল,
ফটিকের জলে ছায়া ছপছপ করে।"
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ৪১)

সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায়, সেখানে আমাদের যাপিত জীবন ও আবহমান বাংলার সমাজচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশ; নদীকে কেন্দ্র করে এ দেশের নারী-পুরুষ তাদের প্রেম-প্রণয়, দাম্পত্য জীবন, প্রকৃতি, মাটি, জল, আবহাওয়া, লোকজীবনের সামগ্রিকতা সবই সৈয়দ হকের কবিতাশিল্পে দেদীপ্যমান হয়ে উঠছে। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ নিম্নরূপ–

'কলাপাতে গরম ভাতের গন্ধ–
নারীটির হলুদ মশলামাখা হাতে যেন বিজনের পাখা
তাকে হাওয়া দেয়,

উঠোনে গাভিটি যেন জীবনের গাঢ় দুধ দেয়।'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ৬৬ ও ৬৭)

সৈয়দ হকের কবিতায় লোকায়ত জীবনের নান্দনিক প্রয়োগ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য– 'সৈয়দ শামসুল হক লোকায়ত জীবন ও লোকবাংলার অন্তর্গত পরিপ্রেক্ষিত, ঐতিহ্যসম্পদ, শব্দসম্ভার প্রভৃতি উপাদানে কবিতাকে সমৃদ্ধ করে বাঙালির মনোলোকের অব্যক্ত কথামালার মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। বাংলা কবিতায় যুক্ত করেছেন সৌন্দর্যের ভিন্নতর মাত্রা।' (হায়দার, ২০১২ : ১৩৬)

সাত.

কল্পনা কবিতা সৃষ্টির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কল্পনার ভেতরে অবাস্তব বিষয়কে কবি বাস্তবসত্যে রূপান্তরিত করেন, যাকে আমরা পরাবাস্তববাদ বলে থাকি। কল্পনা প্রসঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশ বলছেন– 'যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতার ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়' (দাশ, ২০১৬ : ৯)। সৈয়দ হকের কবিতায় এই কল্পনার বিস্তার লক্ষণীয়; তাঁর কিছু কবিতা রয়েছে যেগুলোকে পরাবাস্তব কবিতা বলা যায়। 'সংহিতা' কবিতায় সারা রাত কবি করাতের শব্দ শুনতে পান; তারার প্রপাত ঝরে পড়তে দেখেন। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

'সমস্তটা রাত আমি শব্দ পাই শ্রান্তিহীন কোথায় কে চালায় করাত,
বস্তুর আঁধার চিরে অবিরাম ঝরে পড়ে তারার প্রপাত,'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ২৫০)

কবি স্বপ্ন দেখেন, সব মানুষই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কবির কাছে স্বপ্নগুলো নৌকার মতো মনে হয়, দুঃখ নামে একটি দরিদ্র দিঘি আছে, এই দিঘি দিয়ে নৌকা চালিয়ে কবি শৈশবের বাড়িতে যান। প্রাসঙ্গিক কাব্যচরণ–

'মাঝে মাঝে মনে হয় স্বপ্নগুলো আসলে নৌকো–
আর কিছুই নয়, এই দুঃখ দরিদ্র দিঘিতে অন্যপাড়ে
শৈশবের বাড়ীতে ফিরে যাবার যান।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ৭৮)

কবিকল্পনায় ঝড়ের রাতে বাড়িগুলো এবং বাড়ির দেয়ালগুলো উড়ে যেতে চাইছে। 'অন্তরে বাহিরে এক কালবৈশাখী কথা' কবিতায় সৈয়দ হক বলছেন–

'আহ, কী ঝড় আমি অনুভব করেছিলাম কাল রাতে,
বাড়িগুলো দৌড়চ্ছে তাদের দেয়ালের

ঘেরাটোপের ভেতর থেকে,
দেয়ালগুলো উড়ে যেতে চাইছে তাদের পায়ের নিচে কংক্রিটের
কঠিন সব জুতোর ভেতর থেকে,'
(হক, কবিতাসমগ্র ২, ২০০৯ : ২০৭)

আট.

প্রেম ও নারীভাবনা, যৌনতা, রোমান্টিকতা, বাস্তবতা, নাগরিক ভাবনা, প্রকৃতি ভাবনা, সাম্য-চেতনাসহ আরো বহুবিধ বিষয় সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। নারী-পুরুষের দৈহিক সংস্পর্শ বা তার উপস্থাপনা অনেক সময় অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে যায়। নারী-পুরুষের যৌনতার বিষয়টি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে এসেছে। এটি আমরা সৈয়দ হকের কবিতাতেও পাচ্ছি। তবে তাঁর উপস্থাপনায় বেশ সংযম রয়েছে। জৈবিক তাড়নাকে স্বীকার করে শিল্পময় উপস্থাপনা দেখিয়েছেন তিনি। কেননা, 'রোমান্টিক প্রেমই একমাত্র আরাধ্য নয় মানবজীবনে; মানবজীবনে তাই অনিবার্যভাবে এসেছে দেহ-সংসর্গের আকর্ষণ।' (আহসান, ২০০৮ : ৯৫) প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ নিম্নরূপ–

'ও কিসের শব্দ ঐ দরোজার ওপারের ঘরে?
– একটি মানুষ তার রমণীকে তুলে নিচ্ছে বুকে।
ও কিসের শব্দ ঐ দরোজার ওপারের ঘরে?
রমণী লুকিয়ে গেল তার প্রিয় মানুষের বুকে।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ২১৫)

কুড়িগ্রাম থেকে একদিন কবি ঢাকায় আসেন এবং আমৃত্যু তিনি ঢাকাতেই শহুরে জীবন উপভোগ করেছেন। সংগত কারণেই তাঁর জীবন ও কাব্যাভিজ্ঞতায় নাগরিক ভাবনার সম্মিলন ঘটেছে। শহুরে পরিবেশের যাপিত জীবন, আধুনিক যানবাহন, রেস্তোরাঁর নিয়ন বাতি– এগুলো তাঁর কাব্যচিন্তন-ক্ষমতাকে গভীরতা দিয়েছে। প্রাসঙ্গিক কবিতাংশ–

'জলের উজ্জ্বল মাছের মতো সব রঙিন গাড়িগুলো ঘাই দেয়,
তরুণী চলে যায় একটি তরুণের জামার আস্তিনে রেখে হাত,
উষ্ণদ্বীপ হয়ে অন্ধকারে জাগে নিয়ন-বাতিজ্বলা রেস্তোরাঁ,
লম্বা কারো শিস স্তব্ধতাকে ধরে দুলিয়ে দিয়ে যায় রাম্‌বায়।'
(হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ২৬৫)

নয়.

সৈয়দ হক তাঁর কাব্যজীবনে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এগিয়েছেন। আঙ্গিক, ভাষা, উপস্থাপনা আর কবিতার বিন্যাসেও তিনি নিরীক্ষাপ্রবণ। এটি লক্ষণীয় যে, তাঁর একক কাব্যগ্রন্থের নাম থাকলেও দুই খণ্ডে কবিতাসমগ্র প্রকাশকালে তিনি ওই নাম আর রাখেননি। তাই তাঁর কাব্যপ্রবণতাকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। বেশ কিছু কবিতায় গদ্যভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে; অনেক দীর্ঘ কবিতা রয়েছে, যেগুলো বাংলা কবিতায় অনন্য সংযোজন। কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে স্বদেশ, স্বসংস্কৃতি ও স্বকাল সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে। সৈয়দ হক নিজের দেশ এবং নিজের যাপিত জীবনধারার ক্রম-আবর্তন ও রীতিপদ্ধতি কবিতাশিল্পে ধারণ করতে চেয়েছেন।

তিনি এ দেশের লোকজীবন, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও লোক-অনুভূতিকে কাব্যসাধনার মৌল উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করে কবিতায় তার শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় নদী, নৌকা, নৌকার গুলুই, জেলে, মাঝি, কামার, কুমার, তাঁতি, ঢাক, ঢেঁকি, বীজতলা, মাঠের ফসল, লোহার ঈষ, পলিমাটি– এ রকম আরো অনেক সাধারণ বিষয় অসাধারণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। কবিতা রচনায় তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি ও প্রাতিস্বিকতা আছে; 'আধুনিক কবিতায় জীবনের গভীর অনুভব প্রকাশ করার প্রচলিত পদ্ধতি থেকে বের হয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন নিজস্ব পদ্ধতি। দেশ-বিদেশে, গ্রামে-গঞ্জে প্রভৃতি থেকে আর আশৈশব অভিজ্ঞান থেকে তুলে এনেছেন কবিতার অলঙ্কার।' (হায়দার, ২০০৮ : ১৩৮) গ্রামীণ জীবন-ভাবনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও তিনি শহরকে ভুলে যাননি।

তাঁর কবিতায় ইতিহাস ও ঐতিহ্যসচেতনতা লক্ষণীয়ভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। স্বসমাজ ও স্বসংস্কৃতিকে তিনি কবিতা সৃজনের মুখ্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। রোমান্টিক-প্রেমভাবনায় তিনি স্বতন্ত্র; জৈবিক অনুভূতির শৈল্পিক সমন্বয় তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সবার আগে দেশ, দেশের মাটি ও মানুষের কথা তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দেশপ্রেমের গভীরতা তাঁর কাব্যসাধনার কেন্দ্রমূলে জল সিঞ্চন করেছে। তাই সৈয়দ হকের মুখে শোনা যায়– 'জন্মে জন্মে বাববার / কবি হয়ে ফিরে আসব আমি বাংলায়।' (হক, কবিতাসমগ্র ১, ২০০৮ : ১৪২)

সৈয়দ হকের নিজস্ব কাব্যভাষা আছে। তিনি মানভাষা ও কথ্যভাষা সব ক্ষেত্রেই কাব্যিক আবহ সৃজনে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। নানা ধরনের অলংকার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প নির্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। কাব্যবোধ ও কাব্যভাষায়, অনুভব ও উপলব্ধির গভীরতায় তিনি পরিশুদ্ধ কবি। তাঁর সাবলীল প্রকাশভঙ্গি ও নান্দনিক-

কাব্যিক উপস্থাপনা মনোমুগ্ধকর ও পাঠকনন্দিত। বিষয়বস্তু নির্বাচন, কাব্যাঙ্গিক নির্মাণ-প্রয়াসপ্রচেষ্টা, শৈল্পিক উপস্থাপনার সুর ও স্বর-ব্যঞ্জনা সার্বিক বিষয় মিলিয়ে তিনি বাংলা কাব্যাঙ্গনে অনন্য মাত্রা সংযুক্ত করেছেন।

লেখক পরিচিতি : মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা। ই-মেইল : smarouf26@gmail.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. রহমান, হাসান হাফিজুর (২০০০), *আধুনিক কবি ও কবিতা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
২. হক, সৈয়দ শামসুল (২০০৮), *কবিতাসমগ্র ১*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।
৩. হক, সৈয়দ শামসুল (২০০৯), *কবিতাসমগ্র ২*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।
৪. মাহমুদ, মজিদ (২০০৩), *কেন কবি কেন কবি নয়*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।
৫. হাসান, মাহবুব (২০০৫), *বাংলাদেশের কবিতায় লোকজ উপাদান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
৬. খান, ফরহাদ (১৯৯৬), *প্রতীচ্য পুরাণ*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
৭. ইকবাল, শহীদ (২০০৮), *বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা*, চিহ্ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৮. মুসা, মনসুর (সম্পাদিত, ২০১৩)। *বাঙলাদেশ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৫৮।
৯. আহসান, মোস্তফা তারিকুল, (২০০৮), *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১০. আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯২), *আধার ও আধেয়*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
১১. হোসাইন, খালেদ (২০১৩), *কবিতা-প্রবন্ধ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।
১২. হায়দার, মুহম্মদ (২০১২), *বাংলাদেশের কবিতায় লোকায়ত জীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
১৩. হক, সৈয়দ শামসুল, সাক্ষাৎকার (২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭), *প্রথম আলো*, পৃ. ৩।
১৪. দাশ, জীবনানন্দ (২০১৬), *কবিতার কথা*, কবি প্রকাশনী, ঢাকা।
১৫. ইসলাম, রফিকুল (২০১৩)
১৬. *প্রথম আলো*. ২২ সেপটেম্বর

এ দেশের চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্র

মাহফুজ সিদ্দিকী

এ দেশের পেশাগত চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা শব্দ দুটির জন্ম এখন থেকে ৬৪ বছর আগে, ১৯৫৩ সালে। সংস্কৃতিসংক্রান্ত, বিশেষ করে চলচ্চিত্রসম্পর্কিত পত্রিকা *চিত্রালী*র মাধ্যমে। এটি ছিল তখন অবিশ্বাস্য-অভূতপূর্ব-অভিনব 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' কাণ্ড। কেননা, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তখন চলচ্চিত্র নির্মিত হতো না। চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনো স্টুডিও, শুটিং ফ্লোর, যন্ত্রপাতি তো ছিলই না, এ-সম্পর্কিত চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা ও উদ্যোগও কারও মধ্যে ছিল না। অথচ এ রকম একটি বিরান স্থানে জন্ম নিল 'চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা'।

এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয় এখন থেকে ৬১ বছর আগে, ১৯৫৬ সালে। তবে এক ভীষণ ও ভয়ংকর দ্রোহের আগুনে পুড়ে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্রের উৎপত্তি হয়েছিল বলে, এর ফল হয় সুদূরপ্রসারী। দ্রোহের প্রেক্ষাপট ছিল এ রকম– ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে দুটি রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দান করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে ১৪ আগস্ট। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে ১৫ আগস্ট। মুসলিমদের রাষ্ট্রের নাম 'পাকিস্তান'। হিন্দুদের রাষ্ট্রের নাম 'ভারত'।

স্বাধীনতালাভের পর ঢাকাসহ সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগে যে এখন থেকে তারা নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনযাপন ও নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে করতে পারবে। কিন্তু তা হলো না।

পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মনে অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে নানাভাবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে ধর্মের মিল থাকলেও ভাষাগত পার্থক্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানিরা বাঙালি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের ভাষা বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানিরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, তাদের ভাষা উর্দু। দুটি অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব ছিল হাজার মাইলের ওপর। রাষ্ট্র চালনার যাবতীয় ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসনে বাঙালিরা ক্রমে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এরই মধ্যে ডিসেম্বরে করাচিতে 'পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহল ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ তিনি রেসকোর্স ময়দানে এবং ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার একপর্যায়ে বলেন, The state language of Pakistan shall be Urdu and only in Urdu. অর্থাৎ উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়। জিন্নাহর এ বক্তৃতার মাত্র ছয় মাসের মাথায়, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ করাচির অদূরে হাজরায় জিয়ারত নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি কমিটির যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাতেও বলা হয়, 'উর্দু হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।' এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে গণপরিষদে লিয়াকত রিপোর্টের আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়। পরের মাসের ১৬ তারিখে রাওয়ালপিন্ডির এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

এরপর পূর্ব পাকিস্তান নিবাসী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের সকলেই আশা করেছিল, যেহেতু খাজা নাজিমুদ্দিন এ অঞ্চলের লোক, সেহেতু বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবেন। পরিতাপের বিষয়, তিনি ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' খাজা নাজিমুদ্দিনের এরূপ ঘোষণা ঢাকার ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার করে।

৩০ জানুয়ারি ঢাকায় বাংলা ভাষার দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট,

সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের আহ্বান জানায়। সরকার ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি বানচালের উদ্দেশ্যে ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় দীর্ঘ এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। এতে ছাত্র-জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা এক জরুরি বৈঠকে সমবেত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠের পাশে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সকালে

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল নয়টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠের পাশে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেটের পাশে ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হতে থাকে। বেলা ১১টায় কাজী মাহবুব, অলি আহাদ, আবদুল মতিন, সামিউল হক প্রমুখের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ শুরু হয়। ভাইস চ্যান্সেলর ড. এস এম হোসেনের নেতৃত্বে কয়েকজন শিক্ষক সমাবেশস্থলে যান এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন।

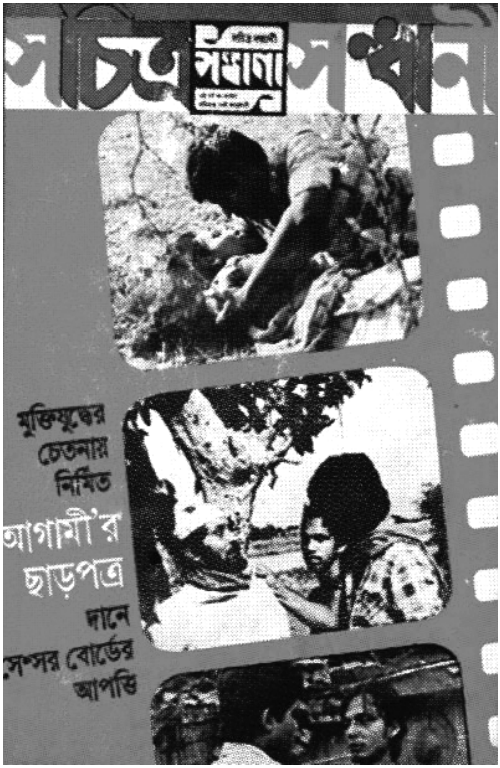

প্রচ্ছদ : সচিত্র সন্ধান

কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মিছিল নিয়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের দিকে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। এ সময় পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে ঘটনাস্থলেই আবুল বরকত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র), রফিক উদ্দিন এবং জব্বার নামের তিন তরুণ মৃত্যুবরণ করেন। পরে হাসপাতালে আব্দুস সালাম (যিনি সচিবালয়ে কাজ করতেন) মৃত্যুবরণ করেন। অজিউল্লাহ নামের নয় বছরের একটি শিশুও পুলিশের গুলিতে মারা যায়। পুলিশের সাথে ছাত্রদের তিন ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলতে থাকে। কিন্তু পুলিশ গুলিবর্ষণ করেও ছাত্র-জনতাকে স্থানচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়।

শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ এ বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক বুদ্ধিজীবীসহ সকল স্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সকলের মনে সৃষ্টি হয় এক সাংঘাতিক-ভয়ানক-জীবন-মরণের দ্রোহ।

এ দ্রোহের আগুনে পুড়ে জন্ম নিল অভূতপূর্ব, অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য সাপ্তাহিক সংস্কৃতি বা চলচ্চিত্র পত্রিকা *চিত্রালী*; জন্ম নিল নতুন ধারার সাংবাদিকতা– 'চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা'। মূলধারার সাংবাদিকতায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সাইজে, দৈনিক পত্রিকার সমান প্রতি সংখ্যা ৮ পাতা করে সাদাকালো প্রকাশিত হলো চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি সাপ্তাহিক *চিত্রালী*, ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন।

সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রকাশক রুহুল আমিন। আরও যুক্ত ছিলেন শামসুল আলম, নূরুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, এ এফ এম নুরুল ইসলাম। ছাপা হলো বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস, ৩০৪ পাটুয়াটুলী ঢাকা থেকে; প্রকাশিত হলো কাউসার হাউস, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে।

পাকিস্তান সরকারের অন্যায়-অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে সাড়া দিয়ে আরও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *বেগম* (১৯৪৭)। প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা-হাস্যকৌতুক এবং ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের খবরও তাতে স্থান পায়। *কৃষ্টি* বেরোয় নারায়ণগঞ্জ থেকে (১৯৪৭)। এর সম্পাদক পরিষদে ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জি, ফুলদা রায় ও জীবন গোস্বামী। আবদুল গনি হাজারীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে বেরোয় মাসিক *কাফেলা* (১৯৪৭) এবং বেরোয় *দীপালী* (১৯৪৭)। ১৯৪৮-এ সিরাজুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *সঙ্কেত*। ১৯৪৯ সালে ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *অনন্যা*। জাহানারা আরজুর সম্পাদনায় *সুলতানা* (১৯৪৯)। *দ্যুতি*র আয়ুষ্কাল ছিল চার বছর, অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় *মানসী*। এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন দুজন–জোৎস্না রানী দত্ত ও অনিমা গুপ্ত। ১৯৫০ সালে আরও একটি সাময়িকী বের হয়, নাম *মুফ্‌তি*। সম্পাদক ছিলেন আবদুল গনি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদী। ১৯৫০ সালে *ইমরোজ* নামে আরও একটি পত্রিকার নাম পাওয়া যায়। খাস খবর চলচ্চিত্র বিষয় নিয়ে মাসিক *সিনেমা* প্রকাশিত হয় বগুড়া থেকে ১৯৫০ সালে। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৫১ ঢাকার ২ এসি রোড থেকে বেশ ঘটা করে প্রকাশ পায়। সম্পাদক ছিলেন আবু তাহের মোহাম্মদ ফজলুল হক। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সুসেন রায়, জেব-উন-নেসা খানম ও ফজলুল করিম। রুহুল আমিন নিজামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক *উদয়ন* ১৯৫০ সালে। এটি পুরোপুরি চলচ্চিত্রবিষয়ক ছিল না। তবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের খবর ও ছবি স্থান পেত। মাসিক *ছায়াবাণী* ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় খালেদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায়। সিদ্দিকী ছিলেন বলিয়াদী জমিদার পরিবারের একজন সদস্য। এ মাসিকটিতে ছায়াছবির খবরই শুধু ছাপা হতো। ১৯৫১ সালে মফিদ-উল-হকের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা *পরিচিতি* প্রকাশিত হয়। এতে চলচ্চিত্র-নাটক-সংস্কৃতিচর্চা-বিষয়ক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ স্থান পেত। *রূপছায়া* প্রকাশ পায় ১৯৫১ সালে। এর অফিস ছিল ৬ রজনী বোস লেন, ঢাকা। ছাপা হতো চাবুক প্রিন্টিং প্রেস, ৫২ জনসন রোড ঢাকা থেকে। নিছক সিনেমা মাসিক ছিল এটি।

বলা বাহুল্য, *চিত্রালী* পত্রিকা (সাপ্তাহিক) শুধু সিনেমা-নাটক-নাচ-গানবাজনা ইত্যাদি খবর নিয়ে বের হবার পর এ প্রদেশে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এক নতুন ধারার সাংবাদিকতা শুরু হয়, যার নাম 'চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা'। এই নতুন ধারার

সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্য কোনো বইপত্র ছিল না, ছিল না কোনো প্রতিষ্ঠানও। আসলে মূলধারার সাংবাদিকতা শিখবার ও শেখাবার কোনো প্রতিষ্ঠানই ছিল না এ অঞ্চলে, এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়।

অথচ *চিত্রালী* পত্রিকার মাধ্যমে নতুন ধারার চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার ওপর দায়িত্ব বর্তাল বোদ্ধাজন ও আমজনতাকে এ কথা বোঝাতে যে 'চলচ্চিত্র শুধু বিনোদনমাধ্যম নয়, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সমাজজীবনেরও রূপকার। যন্ত্রনির্ভর মাধ্যম হলেও সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ও নৃত্যকলার মতোই চলচ্চিত্র জীবনবোধ ও শিল্পরূপকে তুলে ধরতে সক্ষম।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল জনগণকে বোঝানো যে, 'বাণিজ্যিক বৃত্তের বাইরে চলচ্চিত্রের নান্দনিক মননশীল বৈপ্লবিক ক্ষমতার উপলব্ধি আলাদা দর্শক তৈরি করে।' চলচ্চিত্রবিষয়ক যাবতীয় মিশন পাঠকবর্গ তথা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার বৈপ্লবিক কাজ শুরু হলো। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় শ্রেণিবিন্যাসের জন্ম হলো–

ক. রিপোর্টিং; খ. ফিচার রাইটিং; গ. সম্পাদকীয় লেখা; ঘ. চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক, চিত্রকলা, যাত্রা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের সমালোচনা লেখা; ঙ. নাটক-সিনেমা-যাত্রার টুকরো খবর লেখা; চ. ইনডোর শুটিং রিপোর্ট করা, লোকেশন থেকে, অর্থাৎ আউটডোর রিপোর্টিং, ছ. গুঞ্জন লেখা; জ. ফটো ফিচার তৈরি করা; ঝ. ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান-হলিউডের চলচ্চিত্রের খবর তৈরি করা (ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে) ইত্যাদি।

নবধারা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় এই যে শ্রেণিবিন্যাস, আজকের দিনে তা সহজতর মনে হলেও তখন এ ধরনের উদ্ভাবন, বিন্যাস, স্তরে স্তরে সাজানো এক অভিনব বিষয় ছিল। কেননা, এ বিষয়ে কোনো বইপত্র ছিল না, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। সবকিছুই একজন মানুষের মেধা থেকে উৎসারিত।

মূলধারার সাংবাদিকতায় যেমন সাংবাদিকদের মাসিক বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হতো, তেমনি চলচ্চিত্র সাংবাদিক বা নবধারার সাংবাদিকতায়ও সাংবাদিকদের মাসিক বেতন ও অন্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিয়োগ করা হয়। মূলধারার সাংবাদিকেরা যেমন কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, তেমনি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা বা নবধারার সাংবাদিকতায় তখন যারা সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হন, তাদের কারোরই চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক, এমনকি সাংগঠনিক শিক্ষা ছিল না।

দৈনিক পত্রিকা, অর্থাৎ মূলধারার সাংবাদিকতায় যেমন টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে সার্ভিস নিউজের সুবিধা থাকে, চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় সে সুবিধাও নেই। তাই চলচ্চিত্র

সাংবাদিকতা এক ভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতা, যাকে বলা হয় স্পেশালাইজড জব বা বিশেষায়িত বা বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতা।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা যে শুরু হলো, তা একজন 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' ব্যক্তির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ ছিলেন একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' শব্দটার মধ্যে একটা গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে। এ শব্দটাকে বোদ্ধাজন বা প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বরা অত্যন্ত বড় অর্থে দেখেছেন। মনীষী কারলাইল এটিকে ইতিবাচক অর্থে নিয়েছেন। এটিকে তিনি বলেছেন 'পাগলপনা'। তার মতে, মেধাসম্পন্ন বা প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে একধরনের পাগলামি থাকে। যেটাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে মনে করা হয়। কারলাইল বলেছেন, There is no genius in the world without the tinxture of madness. জর্জ বার্নার্ড শ তো কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে বাহবা জানিয়েছেন। তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে দ্রষ্টা এবং স্রষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আরও বলেছেন, এ ধরনের অল্পসংখ্যক কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে জগতের উন্নয়ন সাধিত হয়; জগতের উন্নত স্তরের বিস্তার ঘটে। এ পি জে আবদুল কালামের উক্তিতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *উইংস অব ফায়ার*-এ বলেছেন, 'ব্যবসা পরিচালনাসংক্রান্ত কোনো জনপ্রিয় পুস্তক ছিল সেটি। পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, টপকে টপকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি অংশের ওপর আমার চোখ পড়ল। জর্জ বার্নার্ড শয়ের একটি উদ্ধৃতি। তার মূল কথাটি ছিল, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই বাস্তব জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। শুধু অল্প কয়েকজন মানুষ, যারা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন নয়, তারা জগৎকে নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যায়। এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষদের পৃথক ধারার উদ্ভাবনী কাজকর্মের ওপরই পৃথিবীর অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।'

এ কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষটি, অর্থাৎ এস এম পারভেজ নবধারার সাংবাদিকতা বা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা এবং চলচ্চিত্র তথা সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকার গেটআপ-মেকাপ ও পত্রিকা বাজারজাত করা ইত্যাদি হাতে-কলমে শিখিয়ে নেন। এতে ছিল তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে শিখিয়ে নেন– সৈয়দ শামসুল হক, জহির রায়হান, জিয়া হায়দার, কাইয়ুম চৌধুরী, হুসনা বানু খানম, কালিপদ দাস, মুজিবুল হক প্রমুখকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ফজল শাহাবুদ্দীন, লায়লা সামাদ, রশীদ হায়দার, মোজ্জাম্মেল হক, কালাম মাহমুদ, ডি এ রশীদ, এ টি এম হাই প্রমুখকে।

তৃতীয় পর্যায়ে শেখান আহমদ জামান চৌধুরী, মাহফুজ সিদ্দিকী, খলিলুর রহমান, রফিকুন নবী, মনোয়ার আহমদ, সৈয়দ এনায়েত হোসেন প্রমুখকে।

সৈয়দ শামসুল হক বলেছেন, 'ঢাকায় এসে আমিও সাহিত্য ও চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখালেখিতে একটু একটু মনোযোগ দিলাম। এই সূত্র ধরেই অবজারভার ভবনের

সাথে সম্পর্ক তৈরি হল। আর এই ভবন থেকে প্রকাশিত *চিত্রালী* পত্রিকার সঙ্গে।' ফজল শাহাবুদ্দীন বলেছেন, 'আমার সাংবাদিকতা জীবনের শুরুটাই ফিল্মকে কেন্দ্র করে। পঞ্চাশের দশক থেকেই জড়িত এই পেশার সাথে। *বিচিত্রা* ছাড়াও *সাপ্তাহিক চিত্রালী*, *ইস্টার্ন ফিল্ম*, বিনোদন পত্রিকাগুলোতে কাজ করি।' আহমদ জামান চৌধুরী বলেছেন, '১৯৬৪ সালে সাপ্তাহিক চিত্রালীর মাধ্যমে আমার পেশাগত সাংবাদিক জীবনের শুরু। পরবর্তীকালে এই পত্রিকারই সম্পাদক হই।' আমার নিজের কথা যদি বলি, ১৯৬৫ সালের ১১ জানুয়ারি *চিত্রালী*র মাধ্যমে আমার পেশাগত সাংবাদিক জীবনের শুরু। দীর্ঘ ২৬ বছর আমি *চিত্রালী*তে ছিলাম। পরবর্তীকালে *চিত্রালী*র সম্পাদক হই।

চিত্রালী পত্রিকার ভাষা ছিল সহজ-সরল, যাতে সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে। মানুষকে সচেতন করে তুলে দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্পকলা বাঁচিয়ে রাখতে হলে এর চর্চা আবশ্যক। দেশ ও জাতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসর করতে হলে গণযোগাযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম চলচ্চিত্র এ দেশেই নির্মিত হতে হবে। *চিত্রালী* ক্ষমতাসীন সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে যে এ অঞ্চলে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রয়োজন; এখানে চলচ্চিত্র তৈরি করতে হবে। বলা যায়, *চিত্রালী* রীতিমতো একটি আন্দোলন গড়ে তোলে।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার কল্যাণে এবং গণসচেতনতার মাধ্যমে অতঃপর এ অঞ্চলে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ওঠে। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ড. আবদুস সাদেক স্থানীয় সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র প্রদর্শক ও পরিবেশকদের এক সভা আহ্বান করেন। সভায় এস এম পারভেজ, আবদুল জব্বার খাঁ, ফতেহ লোহানী, ফজলে লোহানী, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অনেক বাদানুবাদ হয়। এ দেশের আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুকূল নয় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলে এস এম পারভেজ, আবদুল জব্বার খাঁ সে কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁরা কলকাতার চিত্র নির্মাণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং চ্যালেঞ্জ দেন যে এ দেশেও চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব। আর চলচ্চিত্র নির্মাণ করেও তাঁরা তা দেখিয়ে দেবেন।

সে চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ২৩ আগস্ট ৫১ নম্বর নারিন্দা রোড ঢাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গঠিত হয় 'ইকবাল ফিল্মস লিমিটেড'। ইকবাল ফিল্মস সিদ্ধান্ত নেয় তারা 'মুখ ও মুখোশ' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে। *ডাকাত* নামে একটি নাটকের বই ছিল। মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ইতিপূর্বে নাটকটি সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। মূল ভূমিকায় অভিনয় করেন ইনাম আহমেদ। নাটকটির লেখক আবদুল জব্বার খাঁ, পরিচালকও ছিলেন তিনি। *ডাকাত* নাম পাল্টিয়ে

চলচ্চিত্র পরিচালক আবদুল জব্বার খাঁ

চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ*-এর পোস্টার

চলচ্চিত্রের নাম রাখা হয় *মুখ ও মুখোশ*। পরিচালনা করেন আবদুল জব্বার খাঁ। ১৯৫৪ সালের ৬ আগস্ট এ ছবির মহরত অনুষ্ঠিত হয় সকালে এ অঞ্চলের অভিজাত হোটেল হোটেল শাহবাগে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সে অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, I accepted the invitation to take part in this ceremony with great pleasure in order to dernonstrate the importance Government give to the indigenous production of Cinema films and establishment of a first class studio. Cinema has an educative value, but its value as an agency which provides entertainment, for the people for transcends anything else. It is imperative for the people to have amusement and amenities of life in order to forget, for however short a time, the cares and worries of this world.

I hope this ventures of messers' Iqbal Films Limited will encourage art and music in this province which is so rich and which, with a little encouragement, can reach great heights.

এ ঘটনার পরপরই সরকারি উদ্যোগে ছবি নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রকল্প তৈরি হতে থাকে। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার নাজির আহমদকে ডেপুটি ডিরেক্টর করে একটি চলচ্চিত্র বিভাগ করে। বিজি প্রেসে তারা একটি এডিটিং টেবিল বসায়। স্টুডিও স্থাপনের জন্য তেজগাঁওয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৬ সালে স্থাপিত হয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা এফডিসি। একটিমাত্র ফ্লোর নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। উল্লেখ্য, এফডিসি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

১৯৫৫ সালের শেষ দিকে ইতালির একটি চলচ্চিত্র মিশন প্রতিষ্ঠান ঢাকায় আসে। ওই মিশন স্টুডিও স্থাপনের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেয়। ১৯৫৬ সালে সরকার এ

দেশে চলচ্চিত্রশিল্প প্রসারের লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে।

১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ওখানে একটি সংস্থা গঠনকল্পে এক কোটি টাকা বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দের দাবি তোলেন প্রাদেশিক চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান নাজির আহমদ। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তারা তখন পূর্ব পাকিস্তানে একটি চলচ্চিত্র সংস্থা গঠনের পরামর্শ দেন। নাজির আহমদ তখন শিল্প দপ্তরের সচিব আসগর আলী শাহ ও শিল্প দপ্তরের উপসচিব আবুল খায়েরের মাধ্যমে বিষয়টি তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নজরে আনেন। তিনি সব শুনে অতিসত্বর 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার বিলের একটি খসড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করার নির্দেশ দেন। তখন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন শেষ হতে মাত্র দুদিন বাকি। এ অবস্থায় আবুল খায়ের ও নাজির আহমদ তাড়াতাড়ি এফডিসি বিলের কাগজপত্র তৈরি করেন।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনের শেষ দিন (সকালে) শেখ মুজিবুর রহমান 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল উত্থাপন করেন।

ওই দিন পরিষদে উপস্থিত ছিলেন ১১ জন মন্ত্রী ও ২৫০ জন সদস্য। স্পিকার ছিলেন আবদুল হাকিম। বিল উত্থাপনের পর প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্য আবদুল মতিন, ইমদাদ আলী ও মনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বিলে সামান্য সংশোধনী আনেন। সংশোধনীর পর বিলটি বিনা বাধায় আইন পরিষদে পাস হয়।

১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনের শেষ দিন (সকালে) শেখ মুজিবুর রহমান 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল উত্থাপন করেন।

এফডিসি স্থাপিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়। এস এম পারভেজ নির্মাণ করেন *মাটির পাহাড়*, *কারওঁয়া*, *বেগানা*। এ জে কারদার করেন *জাগো হুয়া সাভেরা*, *দূর হ্যায় সুখকা গাও*। বেবী ইসলাম করেন *তানহা*। নির্মিত হলো *আকাশ আর মাটি*, *এদেশ তোমার আমার*।

এসব ছায়াছবির খবর ও ছবি *চিত্রালী*তে ঘটা করে ছাপা ও লেখা চলতে লাগল। এযাবৎকাল *চিত্রালী*তে ভারতীয়, পাকিস্তানি ও হলিউডের ছায়াছবির খবর ও ছবি ছাপা হতো। এখন নিজ দেশের নায়ক-নায়িকা, শিল্পী-কুশলীর খবর ও ছবি *চিত্রালী*তে প্রাধান্য পেতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ* মুক্তি পায় ১৯৫৬ সালে। ছবিটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় সদরঘাটে অবস্থিত রূপমহল প্রেক্ষাগৃহে। উদ্বোধন করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। অনুষ্ঠানের রিপোর্ট ও ছবি ঘটা করে *চিত্রালী* পত্রিকায় ছাপা হয় এবং সারা পূর্ব পাকিস্তানে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

নবধারার সাংবাদিকতা তথা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার প্রাথমিক বিজয় দেখে আরও অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেমন *সচিত্র সন্ধানী* (১৯৫৬), *রমনা* (সম্পূর্ণ সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকা) বেরোয় দৈনিক পত্রিকার সাইজে। কায়সার মঞ্জিল, ৪৪ লালবাগ রোড, ঢাকা থেকে *মৃদঙ্গ* (১৯৫৭), ১৫৪ বংশাল রোড ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক *চিত্রাকাশ* (১৯৫৯) প্রকাশিত হয়। *চিত্রাকাশ*-এর মালিক-প্রকাশক ছিলেন আজিজুর রহমান। সম্পাদক সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী। এরপর আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় *চিত্রাকাশ* প্রকাশিত হতো ঢাকার ফোল্ডার স্ট্রিট থেকে। প্রকাশক জনাব তাহা। আবদুর রাজ্জাকের পর *চিত্রাকাশ* সম্পাদনা করেন মতিউর রহমান। মতিউর রহমান ডিএফপিতে চাকরি করতেন; সরকারি চাকরি করতেন বলে তিনি অফিস করতেন রাতে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর *চিত্রাকাশ* নিয়ে নেয় আজাদ পাবলিকেশন এবং আজিজ মিসিরের সম্পাদনায় সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হতে থাকে।

এ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যেসব দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা হয়েছে, সেসব হ্যান্ডকম্পোজে ও লাইনো মেশিনে কম্পোজ হয়ে ফ্লাড মেশিনে ছাপা হয়েছে। ছবিগুলো ব্লক তৈরির মাধ্যমে সাদাকালোতে ছাপা হয়।

কিন্তু ১৯৬৬ সালে প্রকাশনাশিল্পে একটা বড় উত্তরণ ঘটে। শুরু হয় অফসেট প্রিন্টিং। অর্থাৎ গজ ও কালার কিং মেশিনে একযোগে ১২ পৃষ্ঠা ছাপা ও ভাঁজ হয়ে বের হবে।

এ মেশিন সাধারণত চার ইউনিট থেকে ছয় ইউনিট হয়ে থাকে। হ্যান্ডকম্পোজ উঠে গিয়ে আসে ফটোকম্পোজ (আজকের কম্পিউটারের মতোই)। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রিন্টিং ব্যবস্থার প্রবক্তা অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন। এ নতুন সিস্টেমে অবজারভার ভবন থেকে প্রতিদিন ছাপা হয় ইংরেজি পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*, উর্দু পত্রিকা *দৈনিক ওয়াতান*, *সাপ্তাহিক পূর্বদেশ* এবং চলচ্চিত্র পত্রিকা *সাপ্তাহিক চিত্রালী*।

সাপ্তাহিক চিত্রালী পত্রিকা চার রঙে ছাপা হতে শুরু করলে এর প্রচারসংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। *চিত্রালী*র রমরমা ব্যবসা দেখে ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন থেকে একই রকম চলচ্চিত্রনির্ভর পত্রিকা *পূর্বাণী* প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনায় ছিলেন এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। দুই পত্রিকার প্রতিযোগিতামূলক অভিযাত্রায় চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার উৎকর্ষ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হওয়ায় সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা চলচ্চিত্রনির্ভর হয়ে ওঠে। কিছু চলচ্চিত্র সংসদ এগিয়ে আসে চলচ্চিত্রবিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা প্রদানে। সংস্কৃতি সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের জন্য চলচ্চিত্র পরিচালক আলমগীর কবির একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি অবশ্য বেশি দিন টেকেনি। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৮–২১ বছরে সংস্কৃতি সাংবাদিকতার কোনো শিক্ষালয় ছিল না।

পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদের সভাপতি ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

তারপরও এ সময়কার সংস্কৃতি সাংবাদিকতার তথা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার মূলনীতি ছিল ক. দেশজ সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা; খ. সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করা; গ. নৈতিকতা ও শ্লীলতাবোধ জাগ্রত রাখা; ঘ. অনৈতিক, অশ্লীল, পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ, ফিচার,

ছবি, ঘটনা, গুজব ইত্যাদি প্রকাশ না করা; ঙ. সংস্কৃতি সাংবাদিকতা বা চলচ্চিত্র সাংবাদিকতাকে দেশের কৃষ্টি-সাহিত্য–শিল্প সংস্কৃতির অতি আপন অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরা।

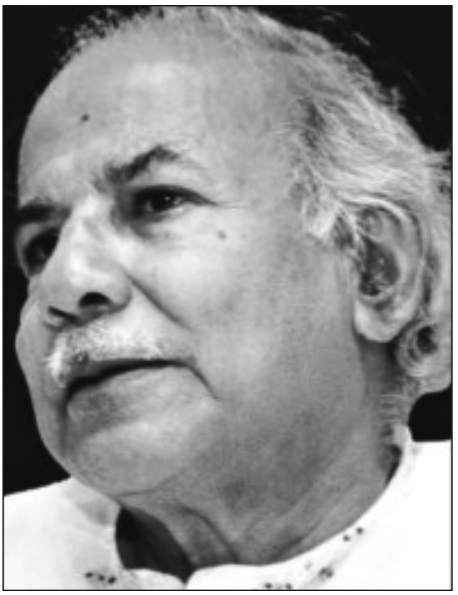

পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদের তৎকালীন সদস্য ওয়াহিদুল হক

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা দর্শক-পাঠকদের এ কথাও বোঝাতে পেরেছে যে দেশে চলচ্চিত্র সংসদ বা ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। সাংগঠনিকভাবে চলচ্চিত্রের শৈল্পিক মর্যাদা বৃদ্ধি, শিল্পধর্মী চলচ্চিত্রের প্রচার, প্রসার, সমীক্ষণ, অনুশীলন করাই চলচ্চিত্র সংসদের অন্যতম লক্ষ্য।

১৯৬২ সালের শেষ দিকে চলচ্চিত্র প্রযোজকদের চেষ্টায় ঢাকায় গঠিত হয় ফিল্ম ক্লাব। সাধারণ সম্পাদক হন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী কলিম শরাফী। তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের আইন ও তথ্য বিভাগের মন্ত্রী এ বি এম গোলাম মোস্তফা ক্লাবের উদ্বোধন করেন। পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ২৫ অক্টোবর। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন আনোয়ারুল হক খান, ওয়াহিদুল হক, মোশাররফ হোসেন চৌধুরী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সবুর, মনিরুল আলম, মুহম্মদ খসরু, জামান খান, ফারুক আলমগীর, ইয়াসিন আমীন ও সালাহ উদ্দিন। এ সংসদের সভাপতি ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। ১৯৬৭ সালের পর এ সংসদের সাধারণ সম্পাদকের পদে আসেন চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাংবাদিক আলমগীর কবির।

সংসদের কার্যক্রম ক্রমে বিস্তার লাভ করায় সংসদের সঙ্গে আরও বিজ্ঞজন জড়িত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পটুয়া কামরুল হাসান, ড. সারওয়ার মুরশিদ, ফরিদা হাসান, লায়লা সামাদ, জাহানারা রহমান, গালিব খান, বিজন সরকার, আবুল খায়ের খান, মাহবুব জামিল, মসিহউদ্দিন শাকের, মোস্তফা আমিন, শফিকুর রহমান, কাইসার চৌধুরী, নওশেরওয়ান রশীদ ও ইকবাল আহমদ। এ সংসদ ধ্রুপদি

১৯৬২ সালে ঢাকায় গঠিত হয় ফিল্ম ক্লাব, ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী কলিম শরাফী

চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী, আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার করে এবং পত্রপত্রিকা ও বুলেটিন প্রকাশ করতে থাকে। এতে চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী ও চলচ্চিত্রের নান্দনিক দিক বেশি প্রাধান্য পেলেও চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা খুব একটা স্থান পায়নি। সম্ভবত চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা বা পুঁথিগত বিদ্যার অভাব ছিল তাদের মধ্যে। কেবল চলচ্চিত্র পরিচালক সাংবাদিক আলমগীর কবির মাঝেমধ্যে চিত্রসমালোচনাসহ চিত্রসাংবাদিকতা সম্পর্কে দু-চারটে বক্তব্য-মন্তব্য কোনো কোনো সেমিনারে প্রকাশ করতেন।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার প্রভাব আরও একধাপ এগোল। গঠিত হলো চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের পৃথক একটি সমিতি। নাম পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি। এর সভাপতি নির্বাচিত হন সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক ফজল শাহাবুদ্দীন। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিকের সিনেমা বিভাগের সাংবাদিকেরা এ সমিতির সদস্য হন। মূলধারার সাংবাদিকদের সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন যেমন সাংবাদিকদের দাবিদাওয়া ও সমস্যার কথা সম্মিলিতভাবে তুলে ধরতে পারে, তেমনি চলচ্চিত্র সাংবাদিকেরা তাদের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার কথা সম্মিলিতভাবে তুলে ধরবে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির মাধ্যমে।

চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি গঠন করার মূল উদ্দেশ্য ছিল দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বোঝানো যে এটা বিশেষ প্রকৃতির সাংবাদিকতা এবং দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা তথা মূলধারার সাংবাদিকতার চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ও কম দায়িত্বপূর্ণ নয়। কেননা, তখন সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড গঠনের আন্দোলন চলছিল।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সাংবাদিকদের বেতন বোর্ডের ঘোষণা দেন, কিন্তু তাতে চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের পৃথকভাবে কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলে তিনি তাঁর পত্রিকা *চিত্রালী*কে সাপ্তাহিক হওয়া সত্ত্বেও মেট্রোপলিটন 'এ' শ্রেণিতে সংযুক্ত করতে সমর্থ হন। তবে তখন চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার গৌরব এটাই যে চলচ্চিত্রবিষয়ক সাপ্তাহিক *চিত্রালী* ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। এটা নিঃসন্দেহে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা তথা

নবধারার সাংবাদিকতার একটি বড় অর্জন ও দ্যুতিময় দৃষ্টান্ত।

১৯৬৫ সালে দুটি বড় ধরনের ঘটনা ঘটে। একটি হলো সাংবাদিকদের জন্য বেতন বোর্ড রোয়েদাদ গঠন। অন্যটি ভারতীয় চলচ্চিত্র পাকিস্তানে প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ঘোষণা। ভারতীয় ছায়াছবি পাকিস্তানে নিষিদ্ধ হওয়ায় মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ছায়াছবি নির্মাণের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। সে সুবাদে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার কদরও বাড়তে শুরু করে।

এদিকে মাত্র এক বছর পর ১৯৬৬ সালে মুদ্রণশিল্পে ঘটল বিরাট উত্তরণ। শুরু হয় অফসেট প্রিন্টিং। অবজারভার গ্রুপের আল হেলাল প্রিন্টিং আনে এ মেশিন। এ মেশিন আনায় এবং অফসেট প্রিন্টিংয়ের নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ *চিত্রালী* রঙিন ছাপার উদ্যোগ নেন এবং পাতা বাড়িয়ে ১২ পৃষ্ঠা থেকে ১৬ পৃষ্ঠা করেন। সাইজ ওই দৈনিক পত্রিকার সমানই রইল। বাড়তি ৪ পৃষ্ঠায় টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ঢোকানো হলো।

১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত, ধরা যায়, চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার বা নবধারার সাংবাদিকতার প্রভাব-প্রতিপত্তির কাল। *চিত্রালী*, *পূর্বাণী*, *চিত্রাকাশ*, *বিচিত্রা*, *চিত্রিতা*, *ঝিনুক*, *জোনাকী*, *অন্তরঙ্গ* প্রভৃতি একালের অভিযাত্রী। এ সময়ে সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, ফজল শাহাবুদ্দীন, আহমদ জামান চৌধুরী, মাহফুজ সিদ্দিকী, আকতারুজ্জামান, আহাদ খান, নরেশ ভূইয়া, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, আজিজ মিসির, সাযযাদ কাদির, শাহাদত চৌধুরী, শেখ আবদুর রহমান, জয়নুল আবেদিন, চিন্ময় মুৎসুন্দী, অভিনয় কুমার দাস, আখতার উন-নবী, গোলাম সারওয়ার, রফিকুজ্জামান, মাসুদুল হক প্রমুখ চলচ্চিত্র সাংবাদিকতাকে অপেক্ষাকৃত গতিশীল করে তোলেন।

চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকা *চিত্রালী* বিবিধ রঙে ছাপা হওয়ার সুযোগে পত্রিকার অঙ্গসজ্জায় বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আনা সম্ভব হয়, যা হটমেটাল বা হ্যান্ডকম্পোজের বেলায় অসম্ভব ছিল। ইচ্ছেমতো বড়-ছোট হেডিং করা, ইচ্ছেমতো পেজ মেকাপ করা, ইচ্ছেমতো ইনট্রো-ইনসেট বসানো, অর্থাৎ মনের মতো করে ছবি ও ম্যাটার দিয়ে পাতা সাজানোর সুযোগ এসে গেল। প্রতিটি পাতা হয়ে উঠতে লাগল আরও দৃষ্টিনন্দন।

বলা বাহুল্য, এ রকম ইচ্ছেমতো পাতা সাজানোর ব্যাপারে কোনো ব্যাকরণের দরকার হলো না। সংবাদপত্রে, বিশেষ করে চলচ্চিত্রবিষয়ক পত্রিকায় এল নতুন ধরনের গেটআপ-মেকআপ, যা পাঠকসমাজকে বিপুলভাবে টানতে লাগল। শুধু তা-ই নয়, বাড়তে থাকে চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের কদর।

শুধু গেটআপ-মেকআপেই নয়, লেখায়ও এল নতুনত্ব। বিষয় অনুপাতে শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপস্থাপনে এক যুগান্তকারী নবধারার সূচনা হলো।

এ যেন এক নতুন বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেল, পাওয়া গেল কোনো বই থেকে নয়, কোনো পত্রপত্রিকা থেকে নয়, বরং ব্যক্তিবিশেষের মেধা, মনন ও চিন্তাচেতনা থেকে।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা ধীরে ধীরে তুঙ্গে উঠতে থাকে। বলা চলে নবধারার এ সাংবাদিকতা মূলধারার সাংবাদিকতার পাশাপাশি স্থান করে নেয়। এ সময় *চিত্রালী*র প্রচারসংখ্যা ছিল এ দেশের দৈনিকসহ সকল পত্রিকার চেয়ে বেশি– এক লাখ বিশ হাজার, যা সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা *দৈনিক ইত্তেফাক*কে ছাড়িয়ে যায়। *ইত্তেফাকে*র প্রচারসংখ্যা ছিল ৮০ হাজার।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই পাকিস্তানি ছায়াছবি প্রদর্শন বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে, অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে ভারতীয় ছায়াছবি প্রদর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এখন ভারত ও পাকিস্তানের ছায়াছবি আমদানি ও প্রদর্শন বন্ধ থাকায় বাংলাদেশে নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণের গতি বেড়ে যায়। ক্রমে ছবির সংখ্যা বাড়তে থাকে, সিনেমা হলের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং চলচ্চিত্র সংসদও প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে।

পাকিস্তান চলচ্চিত্র সংসদের নতুন নাম হলো বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ। এ সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ইভা আলম, মাহবুব আলম, আবদুস সেলিম, বাদল রহমান, হাসেম আনসারী, ইউসুফ রহমান, নাসির লতিফ, রেজিনা আহমদ, লাইলুন নাহার, সারা যাকের, মিনু বিল্লাহ প্রমুখ। কয়েক বছরের মধ্যে ১৫-২০টি চলচ্চিত্র সংসদ গড়ে ওঠে।

খ্যাতনামা সাংবাদিক ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা *বাংলাদেশ অবজারভারে*র তৎকালীন সম্পাদক ও অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম চলচ্চিত্রকার ওবায়দুল হক চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'চলচ্চিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সাংবাদিকদের দায়িত্ব রয়েছে অনেক। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা সম্পর্কে তিনি বলেন, চলচ্চিত্র বহু শিল্প দিয়ে গড়া একটি মাধ্যম। তাই এই মাধ্যমের জন্য পৃথক জার্নালিজমের প্রয়োজন। আর এখন তো স্পেশালাইজড সাংবাদিকতার যুগ। বিষয় অনুযায়ী সাংবাদিকতা বিভক্ত। কাজেই এ ক্ষেত্রেও পারদর্শী সাংবাদিক দরকার। এখন জার্নালিজমে পাস করা সংস্কৃতিমনা তরুণেরা এগিয়ে আসছে সিনে জার্নালিজমে। চলচ্চিত্র নিয়ে প্রতিদিনই পত্রিকায় রিপোর্ট থাকছে। অনুসন্ধানী কাজ হচ্ছে। এটি একটি আনন্দ সংবাদ। তবে চলচ্চিত্রের জন্য গবেষণানির্ভর সাংবাদিকতাও দরকার। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমি পড়াশোনার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলছি।'

লেখক পরিচিতি : **মাহফুজ সিদ্দিকী,** বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির (বাচসাস) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

সহায়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধসমূহ

কালাম, এপিজে আবদুল, 'উইংস অব ফায়ার'।

চৌধুরী, শামীমা, 'ওবায়দুল হক চলচ্চিত্রকার ও সাংবাদিক', বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।

বিক্রমপুরী, শফি, 'ঢাকায় পঞ্চাশ বছর'।

হায়াৎ, অনুপম, 'সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর', বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হায়াৎ, অনুপম, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস'।

মামুন, মুনতাসীর রচিত 'ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী'।

কাদের, মির্জা তারেকুল, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প'।

রায়, সত্যজিৎ, 'বিষয় চলচ্চিত্র'।

মুখোপাধ্যায়, কালীশ, 'বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস'।

সোম, অসীম, 'চলচ্চিত্র কথা'।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ, 'চলচ্চিত্র পত্র'।

দাশগুপ্ত, চিদানন্দ, 'চলচ্চিত্র কী'।

বাহাদুর, সতীশ, (পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষক) 'ফিল্ম এপ্রিসিয়েশন'-এর নোটসমূহ।

এশিয়াটিক সোসাইটি ঢাকা, 'বাংলাপিডিয়া'।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি

অনন্ত মাহফুজ

ভূমিকা

বাংলার সাধারণ জনগণের দ্বারা উদ্ভূত নাট্যকলা বহু বছরের পথ পরিভ্রমণে ইউরোপের নাটক এবং সেখানে শিল্প ও সাহিত্য জগতে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলন, শিল্পভাবনা, দর্শন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পের আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নাটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এ অঞ্চলের নাট্যকারেরাও। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *তরঙ্গভঙ্গ* ও *সুড়ঙ্গ* নাটক দুটিতে পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির প্রভাব স্পষ্ট।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২–১৯৭১)

স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে মঞ্চনাটকে ব্যাপক উন্নতি ঘটে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে সারা দেশে মঞ্চনাটকের চর্চা ও উৎকর্ষ মূলত নাটকের ভেতর দিয়ে সদ্যোজাত বাংলাদেশকে নির্মাণের প্রয়াস; বাহ্যিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের ভেতরের পরিবর্তন সাধন। তবে বাংলাদেশের বর্তমান নাটকের উৎকর্ষের মূলে আছে বাংলা নাটকের হাজার বছরের ঐতিহ্য। এই হাজার

বছরের পথপরিক্রমায় বাংলা নাটক বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, সমাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে; যোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ষাটের দশকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটকের অ্যাবসার্ডিটির প্রভাব এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের একটি অংশ। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ জামিল আহমেদ তাঁর 'নাটক ও নাট্যকলা' নিবন্ধে বলেন :

অধিকাংশ পণ্ডিতজন যে মত সমর্থন করেছেন তা হলো, ঔপনিবেশিক শাসনের মিথষ্ক্রিয়ার ফল হিসেবেই উনিশ শতকে বাংলায় নাট্যকলার উদ্ভব ঘটে। বর্তমান অধ্যায়ে এর বিপরীতে প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে যে, গুটিকতক শহুরে অভিজাতের হাতে নয়, বরং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও ব্রিটিশ শাসনের বহুশত বছর আগে স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারাই নাট্যকলার গোড়াপত্তন হয়। বিবর্তনের এ জটিল ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি, যা ঔপনিবেশিক এবং উপনিবেশ-পরবর্তী নাট্যকলার আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের অবশ্যই বাংলার জনগণের দ্বারা সৃষ্ট নাট্যকলার অভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে।[১]

অধ্যাপক জামিল বাংলা নাটকের প্রবাহকে বাংলার নিজস্ব নাট্যকলা এবং উপনিবেশ প্রভাবিত নাট্যকলা–এ রকম দুটি ভাগে ভাগ করেন। তাঁর মতে, বাংলার নাট্যকলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কাল থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নিম্নোক্ত রীতি-পদ্ধতি-কাঠামোর ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে :

১. সংস্কৃত নাট্য প্রভাবজাত রীতি
২. কথানাট্য
৩. নাটগীত
৪. লৌকিক হাস্যরসাত্মক নাট্য
৫. মিশ্রনাট্য এবং
৬. পুতুলনাচ[২]

বর্ণিত রীতিগুলোর সব কটির সংমিশ্রণে বাংলা নাটকের পথচলা। তবে বাংলা নাটকের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যোগসূত্র থাকতে পারে কথানাট্যের। 'কথানাট্য ইউরোপীয় ধাঁচের কোনো পরিপূর্ণ নাটক নয়। এটি একান্তভাবেই আবহমান বাংলার লোকসাংস্কৃতিক নাট্য আঙ্গিক যা মূলত পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যনির্মাণে প্রভূত সহায়তা করেছে।'[৩] ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমল থেকেই ইউরোপীয় নাটকের প্রভাব পড়তে থাকে বাংলা নাটকে। অনেক গবেষক মনে করেন, বাংলা মঞ্চনাটকের শুরু '১৭৯৫ সালে, কলকাতার ডোমতলায়'[৪]। এই নাট্যশালার নির্মাতা রুশদেশীয় সংগীতজ্ঞ-পহিমবত হেরাশিম লেবেদেফ এই মঞ্চে ১৭৯৫ সালে

মঞ্চস্থ করেন বাংলায় অনূদিত নাটক *The Disguise*। বাংলা নাটকের উৎস ও পথচলা বিবেচনা করলে ১৭৯৫ সালকে বাংলা নাটকের শুরু বলে গ্রহণ করা যায় না।

অধ্যাপক জামিল আহমেদ বাংলার ঔপনিবেশ প্রভাবিত নাট্যকলার সময়কে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে পাঁচটি কালপর্বে ভাগ করেন :

১. ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রবর্তন (১৭৫৩-মধ্য উনিশ শতক)

২. অনুকরণ, আত্তীকরণ ও গঠন (১৭৯৫-১৮৭০)

৩. কল্পনাবিলাস ও গণনাট্যশালা (১৮৭০-১৯২০)

৪. সমাজসচেতনতা ও জাতীয়তাবাদ (১৯২০-৪০)

৫. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্থানীয় নাট্যকলার বিকাশ (১৮৮১-১৯৩৯)[৫]

উপনিবেশ আমলে খুব স্বাভাবিকভাবে বাংলার নাট্যকলা ইউরোপীয় নাট্যরীতি ও আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি, সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং গণমাধ্যমের উন্নয়নের কারণে বিশ্বনাটকের প্রভাব বাংলা নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় নাটকের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি আমাদের জনপদের নাট্যরীতিকে খুব একটা আমলে নিয়েছেন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন না। এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' নামক নিবন্ধে লিখেছেন : বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত; তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি এবং কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারি দিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়।[৬]

এ কথা ঠিক যে 'বিবর্তনের পথপরিক্রমায় বাংলা নাটক নানা পরীক্ষণ বা গ্রহণ-বর্জনের পর বর্তমানে যে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে এককথায় ঋদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। বাংলা নাটকের প্রাচীন ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক নাট্যভাবনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে এই ধারণা প্রবল হয়।'[৭]

অ্যাবসার্ড নাট্যরীতি : উৎপত্তি ও পথপরিক্রমা

১৯৫৭ সালের নভেম্বরের ১৯ তারিখ। সান কোয়েন্টিন কারাগারের এক হাজার চার শত কয়েদির সামনে স্যামুয়েল বেকেটের সাড়াজাগানো নাটক *ওয়েটিং ফর গডো* মঞ্চস্থ করবে সানফ্রান্সিসকো অ্যাক্টরস' ওয়ার্কশপ। বোদ্ধা দর্শকের এই নাটক

কারাগারের অপরাধীরা কীভাবে গ্রহণ করবে, এ নিয়ে নাটকের কুশীলব আর কলাকুশলীদের অস্থিরতা ছিল। মঞ্চের পর্দা উঠলে নাটকের পরিচালক হারবার্ট ব্লাও দর্শকের উদ্দেশে বললেন, 'এই নাটকটিকে আপনারা একটি জাজ সংগীত মনে করতে পারেন। আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকটি দেখবেন, তা-ই খুঁজে পাবেন এখানে।' অবিশ্বাস্য নীরবতায় নাটকটি মঞ্চস্থ হলো। এই তথ্য মার্টিন এসলিনের বিখ্যাত গ্রন্থ *দি থিয়েটার অব দ্য অ্যাবসার্ড*-এ উল্লেখ আছে।[৮] কবীর চৌধুরী তাঁর *প্রসঙ্গ নাটক* গ্রন্থে স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো* নাটকের আলোচনায় বলেন :

স্পষ্টতই নাটকটি রূপকাশ্রয়ী, প্রতীকধর্মী। কোন বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ কালে এর ঘটনাবলী সংগঠিত হয় না, যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের মনের হতাশা, শূন্যতাবোধ, অন্তহীন ক্লান্তি একটা মিথ্যা আশা-স্বপ্ন-কল্পনার প্রতীক্ষার প্রেক্ষাপটে তার আবেদন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে...যদি এই নাটকের বিষয়বস্তু বলে কোন কিছুকে চিহ্নিত করতে হয় তা হচ্ছে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে অন্তহীন প্রতীক্ষা।[৯]

মার্টিন এসলিন[১] 'The Theatre of the Absurd' শব্দগুচ্ছ প্রথম ব্যবহার করেন। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের একদল নাট্যকারের নাটকের বিশেষ ধরনকে অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে অভিহিত করা হয়। তাঁরা হলেন অ্যাডামভ, স্যামুয়েল বেকেট, জা জেঁনে, আইওনেস্কো ও হ্যারল্ড পিন্টার। নাটকের এই বিশেষ আঙ্গিকটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষ কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। তবে অনেকে অ্যাবসার্ড নাটকের উৎপত্তির সঙ্গে রোমান মাইম নাটকের সম্পর্ক খুঁজে পান, যার সঙ্গে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁ সময়ের হাস্যরসাত্মক উপাদানসম্পন্ন নাটকের যোগসূত্র আছে। তবে পঞ্চাশের দশকের স্বর্ণযুগে পদার্পণ করতে অ্যাবসার্ড নাটককে অনেকটা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে আসতে হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে অ্যাবসার্ড নাটকে ড্যাডাইজম ও সুররিয়ালিজমের ব্যাপক প্রভাব আছে।[১০] কবীর চৌধুরী 'লিটরেচার অব দ্য অ্যাবসার্ড'-এর সংজ্ঞায় বলেন : বেশকিছু নাট্য ও কথাসাহিত্য-কর্মের ক্ষেত্রে এই অভিধা প্রয়োগ করা হয় যেখানে আমরা মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করি উদ্ভট ও অসম্ভব রূপে, যেখানে মানবতার উদ্দেশ্যহীন অবস্থান এমন একটা অস্তিত্বে যা তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিহীন। এই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য করা যাবে অভিব্যক্তিবাদ (expressionism) ও পরাবাস্তববাদের (surrealism) মধ্যে। গত তিন চার দশক ধরে জাঁ পল সার্ত্রে ও আলবেয়ার কাম্যুর অস্তিত্ববাদী দর্শন এ্যাবসার্ড সাহিত্যধারাকে পুষ্ট করেছে।[১১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবসভ্যতা, মানুষের অগ্রগতি এবং অস্তিত্ব নিয়ে পুনর্বার ভাবনা শুরু হয়। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা মানুষের অগ্রযাত্রা আর অস্তিত্বের অর্থকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। পঞ্চাশের দশকে তাই ইউরোপে অস্তিত্ববাদী ও অধিবাস্তববাদী ভাবধারার প্রকাশ ঘটে। আলবেয়ার কাম্যু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য মিথ অব সিসিফাস*-

এর 'Absurdity and Suicide' নামক রচনায় ছিন্নভিন্ন বিশ্বাসের পৃথিবীতে মানুষের অবস্থা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন :

> A world that can be explained by reasoning, however faulty, is a familiar world. But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger. His is an irremediable exile, because he is deprived of memories of a lost homeland much as he lacks the hope of a promised land to come. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of Absurdity.[১২]

মার্টিন এসলিন কর্তৃক The Theatre of the Absurd শব্দগুচ্ছ আবিষ্কার হওয়ার পর অ্যাবসার্ড ধারার নাটককে নানা অভিধায় অভিহিত করার প্রয়াস দেখা যায়। কেউ এই নাটককে কৃষ্ণ কমেডি, কেউ নন-কমিউনিকেশন নাটক আবার কেউ নববাস্তবতার নাটক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কবীর চৌধুরী লিখেছেন : জন রাসেল টেইলর 'পেঙ্গুইন ডিকশনারি অব থিয়েটার'-এ (১৯৬৫) লিখেছেন যে, এ্যাবসার্ড নাটক কথাটি উনিশশো পঞ্চাশের দশকের কতিপয় নাট্যকারের কাজকে বোঝায় যারা নিজেদের কোনো একটা বিশেষ স্কুলের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা না করলেও এই বিশ্বে মানুষের সংকটময় অবস্থান সম্পর্কে কিছু একটা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী, যে দৃষ্টিভঙ্গি কাম্যু তুলে ধরেছেন তাঁর বিখ্যাত 'সিসিফাস মিথ' প্রবন্ধে (১৯৪২)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিশ্বে মানবতার উদ্দেশ্যহীন অবস্থান এমন একটা অস্তিত্বের মধ্যে যা তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অসমঞ্জস ও সঙ্গতিহীন। লক্ষ্যণীয় যে এ্যাবসার্ড কথাটির অভিধানগত আক্ষরিক অর্থ সুষমা-বর্জিত, সুরসঙ্গতি বহির্ভূত, আউট অব হারমনি। রাসেল টেইলর বলেছেন : 'আমাদের সকল কর্মে এই উদ্দেশ্যহীনতার অনুভূতি...একটা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার জন্ম দেয় যা এ্যাবসার্ড নাট্যকারদের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু....।'[১৩]

এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষের ভেতরের সংকট ও অস্তিত্বহীনতাকে প্রকটভাবে উপস্থাপন করে। মনুষ্যজীবনের অর্থহীনতা, অনিশ্চয়তা ও শূন্যতা উপস্থাপনের রীতিটিও তাই সাধারণ অর্থে উদ্ভট, কখনো হাস্যরসাত্মক ও অর্থহীন অঙ্গভঙ্গি। আয়োনেস্কো অ্যাবসার্ডিটি সম্পর্কে বলেছেন, 'Absurd is that which is devoid of purpose...Cut of from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost; all his action become senseless, absurd, useless.'[১৪]

জিরাদু, আঁন্যুই, সালাক্রু, সারৎ ও কাম্যুর নাটকে জীবনের অর্থহীনতা, শূন্যতা আর নৈতিকতার অধঃপতনের মতো আধুনিক সংকটগুলো লক্ষ করা যায়। কিন্তু এই নাট্যকারদের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের মূল পার্থক্যটি হলো উপস্থাপন রীতিতে।

অ্যাবসার্ড নাট্যকারগণ মনে করেন, জীবনের নব অর্থহীনতা, যুক্তিহীনতা আর শূন্যতাবোধকে প্রথাগত ধারায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত করা অসম্ভব। এ কারণে, তাঁদের সৃষ্ট চরিত্র ও চরিত্রগুলোর ভাষা, আচরণ ও অন্যান্য কাজের মধ্যেও এই অর্থহীনতা আর শূন্যতাবোধ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হলো। 'বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের মধ্যে এই জাতীয় একটা ঐক্য গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াসই অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের সঙ্গে অস্তিত্ববাদী নাট্যকারদের পার্থক্য সূচিত করে।'[১৫]

আরভিং ওয়ার্ডল তাঁর *নিউ ইংলিশ ড্রামাটিস্টস*-১২ গ্রন্থে অ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে সর্বজনগ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞার কবীর চৌধুরীর বাংলা অনুবাদ :

এর (অ্যাবসার্ড নাটকের) বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো বহির্বিশ্বের জায়গায় একটি অন্তর-ল্যান্ডস্কেপ নির্মাণ, স্বপ্ন-কল্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা অবলুপ্তি, সময় সম্পর্কে মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে যাকে ইচ্ছামতো সম্প্রসারিত ও সংকুচিত করা যায়, একটা অস্পষ্ট তরল পরিমণ্ডল যা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপক-প্রতীকের সাহায্যে মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরতে সক্ষম, এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার চরম অসম্বন্ধ অর্থহীন ডামাডোলের বিরুদ্ধে লেখকের একমাত্র রক্ষাকবচ হিসেবে ভাষা ও আঙ্গিকের লৌহ-কঠিন অভ্রান্ততা।[১৬]

অ্যাবসার্ড নাটক সেই সময়ে 'অ্যান্টি-লিটারারি' আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে; এর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে প্যারিস। মার্টিন এসলিন লিখেছেন : This does not mean that the Theatre of the Absurd is essentially French. It is broadly based on encient strand of Western tradition and has its exponents in Britain, Spain, Italy, Germany, Switzerland, Eastern Europe and the United States as well as in France.[১৭]

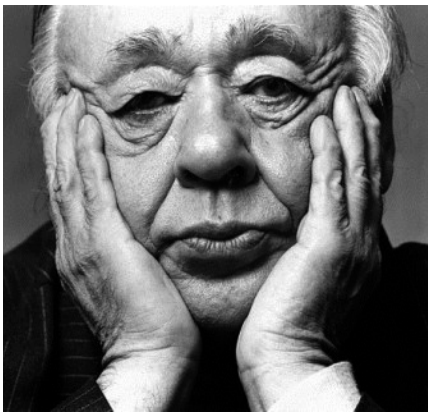
অ্যাবসার্ড নাটকের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা ইউজিন ইয়োনেস্কো

অ্যাবসার্ড থিয়েটারের প্রভাব পড়েছিল ফ্রান্সের বোরিস ভিঁয়া, ইতালির এৎসিও দেরিকা ও দিনো বুজাতি, জার্মানির উলফগ্যাঙ্গ হিল্ডশাইমার, গুন্টার গ্রাস, স্প্যানের ম্যানুয়েল দ্য পেড্রোলো, আমেরিকার এডওয়ার্ড এলবি, জ্যাক নেলবারসহ অনেকের ওপর। আর্থার অ্যাডামোভ অ্যাবসার্ড আঙ্গিকে লিখেছেন *প্যারডি*, *মার্চের গতিধারা*, *প্রফেসর টারান*, *পিং পং*, *বসন্ত ৭১*। *পিং পং* তাঁর সবচেয়ে আলোচিত নাটক। জ্যাঁ জেন্যের

বিখ্যাত নাটকগুলোর মধ্যে *ডেথওয়াচ*, *দি মেইডস* এবং বহুল মঞ্চায়িত ও আলোচিত *দ্য ব্যালকনি*। কোনো কোনো সমালোচক ইউজিন ইয়োনেস্কোকে আখ্যায়িত করেছেন অ্যাবসার্ড নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা হিসেবে। কারণ, অ্যাবসার্ড নাটকের তাত্ত্বিক ও আঙ্গিকগত বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা-সমালোচনা করেছেন তিনি। ইয়োনেস্কোর বিখ্যাত নাটকগুলো হলো *দ্য লেসন*, *দ্য ফিউচার ইজ ইন ইগস*, *রিনোসেরস* এবং অত্যন্ত আলোচিত নাটক *দ্য চেয়ারস*। সম্ভবত সবচেয়ে আলোচিত অ্যাবসার্ড নাটক স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গডো*। ১৯৫৬ সালে তিনি রচনা করেন *অল দ্যাট ফল*।[১৮] বেকেটের অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে *এন্ডগেম* এবং *ক্রাপস লাস্ট টেপ*। হ্যারল্ড পিন্টারের *দ্য ডাম্প ওয়েটার*, *দ্য ডোয়ার্ফস*, *দ্য কেয়ারটেকার*, *দ্য লাভার* এবং *দ্য হোমকামিং* বেশ আলোচিত অ্যাবসার্ড নাটক।

মুনীর চৌধুরী

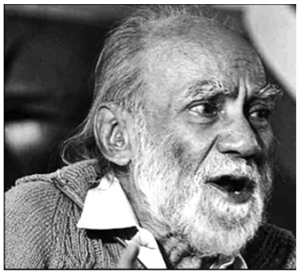
বাদল সরকার

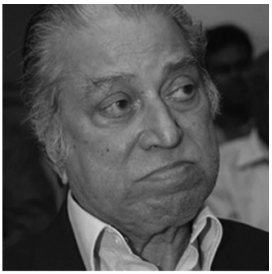
সাঈদ আহমদ

বাংলা সাহিত্যে হুবহু অ্যাবসার্ড আঙ্গিকে কোনো নাটক রচিত হয়নি। তবে অনেক নাট্যকারের নাটকে অ্যাবসার্ড নাটকের প্রভাব আছে। এডওয়ার্ড অ্যালবি ১৯৬৬ সালে রচনা করেন *আ ডেলিক্যাট ব্যালে*। তার চার বছর আগে ১৯৬২ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখেছেন *তরঙ্গভঙ্গ*। কাছাকাছি সময়ে ১৯৬১ সালে সাঈদ আহমদ লেখেন *দ্য থিং* নামে অ্যাবসার্ড ধারার প্রথম নাটক। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে ঢাকার বিখ্যাত নাট্যদল 'ড্রামা সার্কেল' নাটকটি বাংলায় *কালবেলা* নামে মঞ্চস্থ করে।[১৯] সাঈদ আহমদের পরের দুই নাটক *মাইলপোস্ট* ও *তৃষ্ণায়* অ্যাবসার্ড নাটকের গভীর প্রভাব আছে। সমসাময়িক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকার বাদল সরকার ১৯৬২ সালে অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক *এবং ইন্দ্রজিৎ* রচনা করেন। কবীর চৌধুরী মনে করেন :

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাটক মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-৭১) 'কবর'। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে সৃষ্ট এই নাটকের রচনাকাল ১৯৫৩ সাল। এই নাটকেরও স্থানে স্থানে এ্যাবসার্ড নাটকের আভাস লক্ষ্যণীয়, যেখানে বাস্তব-অবাস্তবের ধূসর ও অস্পষ্ট, যেখানে বেদনা ও যন্ত্রণার মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের ঝলকানি, তবে সেই আভাস প্রান্তীয়, কেন্দ্রীয় নয়।[২০]

এক সাক্ষাৎকারে সাঈদ আহমদ ওয়ালীউল্লাহর নাটক সম্পর্কে বলেছিলেন, 'ওনার নাটকগুলোকে কিন্তু অ্যাবসার্ডধর্মী বলা যাবে না, Existentialism ওনার নাটকে আছে।'[২১]

ওয়ালীউল্লাহর নাটকে অ্যাবসার্ডিটি

ওয়ালীউল্লাহর নাটক মাত্র চারটি। অনেক সমালোচক বলেন, উপন্যাস ও ছোটগল্পে ওয়ালীউল্লাহকে যতটা শক্তিশালী মনে হয়, নাট্যসাহিত্যে তাঁকে ততটা পাওয়া যায় না। তাঁর বহুল আলোচিত নাটক *বহিপীর* প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। ওয়ালীউল্লাহর *সুড়ঙ্গ* (১৯৬৪) ও *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬৫) নাটকে অ্যাবসার্ডিটির প্রভাব বেশি লক্ষ করা যায়। *তরঙ্গভঙ্গ* নিয়ে কবীর চৌধুরী লিখেছেন : নাটকটির মধ্যে এ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ সহজেই ধরা পড়ে। এই নাটকের জগৎ ঠিক অবাস্তব নয়, পরাবাস্তবও নয়, অবাস্তব ও অসম্ভবের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এই জগৎ। জনৈক সমালোচকের ভাষায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশেষ আঙ্গিক কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গির গুণে 'তাঁর চরিত্রগুলির বিভিন্ন কৌণিকতা, অজানা মোড়, অন্ধকার বাঁক আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে। আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও বিশ্বাস্য ঠেকে কিম্বা বিশ্বাস্য চরিত্র হঠাৎ অবিশ্বাস্য অথবা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা ভাবি এমন হওয়া সম্ভব, আর সম্ভব যদি হয় তা হলে চরিত্রগুলির এমন সংলাপ, আচরণ একেবারে বেমানান নয়। এভাবে সৈয়দ আমাদের বাস্তব এবং অবাস্তবের মধ্যে দোলায়মান রাখেন, যেমন তিনি রাখেন তাঁর চরিত্রদের।'[২২]

এ নাটকের ঘটনা শুরু হয় একটি বিচারালয়ে। 'কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামি আমেনা। গ্রাম্য মেয়ে; বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। পরনে সাদা শাড়ি। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা।'[২৩] আমেনাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে সন্তান ও স্বামী হত্যার অভিযোগে। তার বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেছে মৌলভি আব্দুস সাত্তার নেওলাপুরী। তার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ নিজের স্বামী হত্যা :

জজ : অপরাধ কী আসামির?

আব্দুস সাত্তার : বল আসামি তোমার অপরাধের কথা, বল নির্ভয়ে। জজ সাহেবকে ভয় কোরো না। তিনি অতিশয় দয়াবান। বল, বল তোমার স্বামী হত্যার কাহিনী।

জনতা : (অভ্যন্তর থেকে সমবেতভাবে, অতি বিস্ময়) স্বামী হত্যা!

আব্দুস সাত্তার : হ্যাঁ, স্বামী হত্যা। প্রথমে স্বামী হত্যা, তারপর সন্তান হত্যা। বল আমেনা, বল তোমার জঘন্য নিষ্ঠুর পাপের কথা, কিছু ঢেকো না।

(দর্শকের দিকে তাকিয়ে) স্বামীর নাম কুতুব শেখ। মেদমাংস নাই, রোগাটে শরীর। কিন্তু কাজে-কর্মে বড় মন। শক্তি-সামর্থ্য নাই, কিন্তু নিয়ত-কলমার বিষয়ে সদাসচেতন। বল আমেনা, সে-মানুষ যখন নিদারুণ রোগে শয্যাশায়ী, তখন কী করে তার জীবনাবসান ঘটিয়েছিলে।[২৪]

আসামি আমেনা চরম অভাবের কারণে শিশুপুত্রকে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়ে গলা টিপে হত্যা করে। আমাদের বিবেকবোধহীন সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রতিনিধি, যে মানবিকতা জানে না এবং মানুষের অস্বাভাবিক কাজের পশ্চাতের কারণ খোঁজে না, সেই মৌলভি আব্দুস সাত্তার নেওলাপুরী আমেনার সন্তান হত্যার ঘটনা দেখে ফেলে এবং আদালতে মামলা করে। নাটকের আরেক চরিত্র ভিখারিনী, আমাদের যাত্রানাটকে বিবেকের চরিত্রের মতো। তার দীর্ঘ সংলাপের অংশবিশেষ থেকে এই ঘটনার বিস্তারিত পাওয়া যায় : ...সেদিন দুপুরবেলা উঠানে বসে আমেনা, পাশে চার সন্তান ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে ক্ষিধেয়। সে গিয়েছিল মিঞাদের বাড়িতে কাজের খোঁজে। কিন্তু মিঞাদের বাড়িতে কাজ নাই। আজও নাই কালও নাই। মিঞার বিবি নাকের নথে ঝট্কা দিয়ে বলল, না গো বেটি, তোমার কোলের এইটুকুন বাচ্চা কেঁদে-কেঁদে জান খেয়ে ফেলবে, বড় ছেলেমেয়েগুলো ঘরে-বাইরে ছুটোছুটি করে পাগল বানিয়ে দেবে। তুমি তাদের সামলাবে না কাজ করবে। শেষ বারের মতো আমেনা হয়তো বলেছিল, কাজ না দিলে না খেয়ে যে মরে যাব ছেলেমেয়ে নিয়ে। উত্তর না পেয়ে অবশেষে বলেছিল, আজ অন্তত চারটে চাল দিন। মিয়ার বিবি ঝামটা দিয়ে বলল, অনেক দিয়েছি, কিন্তু দেয়ার একটা সীমা আছে। আর দিতে পারি না। উঠানে বসে সে কথাই ভাবছিল আমেনা। হঠাৎ তখন উঠান অতিক্রম করে কে তাকে কানে-কানে বলেছিল, আমেনা, আমি যা বলি তাই কর। কে বলেছিল সে কথা?[২৫]

সন্তানের খিদের জ্বালা প্রশমনে তাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় হয়তো আমেনার সামনে খোলা ছিল না। স্বাভাবিকভাবে আমেনার বিরুদ্ধে মামলা হয়। আমরা দেখি বিচারালয়ের দৃশ্য :

পর্দা উঠলে দেখা যাবে বিচারকের আসনে জজ নিদ্রাচ্ছন্ন। মাথা পিছনের দিকে হেলানো; মুখটা কিছু খোলা। বয়স পঞ্চাশের উপরে।

মঞ্চের প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি জজের প্রতি। কেরানি মাথাগুঁজে কলম ঘষছিল, সে মুখ তুলে জজের প্রতি একবার তাকায়, তারপর চাপরাশির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে দুয়েকজন উঠে ভালো করে চেয়ে দেখে, জজসাহেব সত্যি ঘুমিয়ে কি না।[২৬]

নাটকের প্রধান চরিত্র, মামলার বিবাদী, আমেনা নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংলাপহীন। সমগ্র বিচারপ্রক্রিয়া, বিচারকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক বিচারপ্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই এর পশ্চাতে গূঢ় অর্থ নিহিত থাকে। মূলত মৌলভি নেওলাপুরীই এই সমাজ, রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থার প্রতিনিধি। ভিখারিনী ছাড়া আসামির পক্ষে এখানে কথা বলার কেউ নেই। কিন্তু তার সমর্থন আদালতের বিচারপ্রক্রিয়াকে আমেনার পক্ষে নিতে পারে না। এ কারণে নাটকের শেষ দৃশ্যে বিচারের রায় পড়া না হলেও পাঠক বুঝেই যান যে খুনের অভিযোগ থেকে আমেনার মুক্তি মিলবে না :

একটি শ্রোতা : (কৃত্রিম দুঃখের সঙ্গে) আহা!

দ্বিতীয় পুলিশ : (চোখ রাঙিয়ে) আবার গোলমাল?

শ্রোতা : কী জুলুম, গোলমাল কোথায়? হঠাৎ দুঃখ হলো মনে, ভাবটা চেপে রাখতে পারলাম না।

দ্বিতীয় পুলিশ : দিন-দুপুরে দুঃখ কিসের?

প্রথম শ্রোতা : আসামির কথা ভাবছিলাম। সবাই বলছে তার ফাঁসি হবে। ভাবলে দুঃখ হয় না?[২৭]

ভিখারিনী পাঠকের বিবেকের কাজ করে। সাধারণ অর্থে এ রকম একটি চরিত্রের মাধমে প্রতীকী সংলাপ কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। যেহেতু প্রতীয়মান হয় যে এই বিচারকাজে আদালতে আমেনার নিজের পক্ষে কথা বলা কোনো অর্থ বহন করবে না, সে কারণে ভিখারিনীর উপস্থিতি পাঠককে আস্বস্ত করে :

ভিখারিনী : তারপর সূর্য ডুবে যায়, আকাশে ওঠে চাঁদ, ধানের ক্ষেতে মরে যায় হাওয়া : বিশ্বভূমণ্ডল আপন-আপন চক্রপথে ঘুরতে থাকে নীরবে। আবার চাঁদ ডুবে যায়, পূর্ব আকাশে ওঠে সূর্য, হাওয়া জাগে বলে ধানক্ষেতে আন্দোলন হয় : সহস্র চক্রপথে বিশ্বভূমণ্ডলের গতি শ্লথ হয় না। দিক্‌ভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু প্রাণ ধড়ফড় করে গো, প্রাণ ধড়ফড় করে। আসামির অপরাধ গুরুতর, কিন্তু কেউ নেই যে তার পক্ষ থেকে একটি কথা বলবে। এত নিঃসঙ্গ মানুষের ওপর মৃত্যুর রায় দিতে হাত ওঠে কী করে?[২৮]

'নীরব আসামীর সপক্ষে সমস্ত সমাজ রুদ্ধবাক হ'য়ে থাকলেও জনৈক যুবকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে, ব্যর্থ অকৃতকার্য কন্ট্রাক্টর মতলুব আলীর মনেও রয়েছে আসামীর প্রতি পক্ষপাত ও সমবেদনা।'[২৯] তবে অনেক নাট্যসমালোচক মনে করেন, যুবক ও মতলুব আলী কেউই সাহসী চরিত্র নয়। আসামির জন্য তার সমবেদনা অপরিপক্ব, কারও পাশে সাহস নিয়ে দাঁড়াবার মতো মানসিক জোর তার হয়নি :

যুবক : (আপন মনে নিম্নগলায় কিন্তু অধীরভাবে) আমি কিছুই বুঝতে পারি না। জীবনের সংগ্রামে যারা হেরে যায় তারাই অবশেষে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন তারা হারে? উত্তর জানতে আসি বিচারালয়ে, কোনোই উত্তর পাই না।

ভিখারিনী : (কৌতুকের সঙ্গে যুবকের দিকে তাকায়; যুবক লক্ষ্য করে না।)

যুবক : (একটু থেমে) কেন আমার জানবার এত ইচ্ছা, কেনই-বা এত কৌতূহল? কিন্তু মনে হয়, এ-কৌতূহলের জন্মস্থান যেন নিদারুণ ভীতির মধ্যে। আসলে আমার মনে ভয়ের শেষ নাই। হয়তো জীবনসংগ্রামে যারা হেরে গেছে তাদের দেখে মনে যেন সাহস সৃষ্টি করতে চাই। অথবা জানতে চাই কোথায় সে-সীমারেখা যার একধারে জয়, অন্যধারে পরাজয়।[৩০]

তরঙ্গভঙ্গ নাটকের বিচারপ্রক্রিয়া আমাদের সামাজিক দীনতা, বিবেকহীনতা ও অপরাধীকে কেবল অপরাধী হিসেবে তুলে ধরবার হীনম্মন্যতাকে উপস্থাপন করে। অপরাধের পশ্চাতের কারণগুলো এখানে অস্পষ্ট থাকে অথবা বিবেচনায় রাখা হয় না। চাপরাসির কিছুটা বোধ থাকলেও বিচারকাজের প্রধান মানুষটির তা থাকে না।

যে সমাজব্যবস্থায় অপরাধের চেয়ে অপরাধীকে বেশি ঘৃণ্য মনে করা হয়, সেখানে ন্যায়বিচার আশা করা অর্থহীন। এ কারণে নাটকের উপস্থাপনরীতিতে এই অর্থহীনতা দৃশ্যমান। প্রথম দৃশ্যটি বিচারালয়ের। দ্বিতীয় দৃশ্যের অর্ধেক জেলখানা এবং বাকি অর্ধেক জজের শোবার ঘরের সাজেশন। নাট্যকার দ্বিতীয় দৃশ্যটি সাজিয়েছেন এভাবে :

মঞ্চের মধ্যভাগে আবছায়ার মধ্যে ভিখারিনীকে দেখা যাবে। সে গ্রামবাসীদের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্র প্রায় অন্ধকারের মধ্যে মিশে থাকবে। ডান দিকে জেলের লোহার খাটে আবদুস সাত্তার শুয়ে। তবে ঘুমিয়ে যে নয় তা বোঝা যাবে। তার খাটের পাশে একটি শিকের দরজা। পেছনে পার্টিশন জাতীয় কিছুতে জেলের একখণ্ড দেয়াল। বিপরীত দিকে সেকেলে আমলের বৃহৎ একটি খাটে জজ শায়িত।[৩১]

নাটকের প্রথম দুটি দৃশ্যের মধ্যে কিছু মিল এবং কিছু অমিল আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের বিচারালয়ের ঘটনা ঘটে দিনে। অন্যদিকে দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনার সময় রাত। সারা দিনের কাজের রিফ্লেকশন এই দৃশ্য। পাশাপাশি তৃতীয় দৃশ্যকে নাট্যকার প্রথম দৃশ্যের বিপরীতে তুলে ধরেছেন। 'নাটকের প্রথম দুটি দৃশ্যে আমরা পাই মনো-বিচারালয়। শেষ দৃশ্যে দেখি বাস্তব-বিচারালয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সবই একরকম।'[৩২] নাট্যকার শেষ দৃশ্যের মঞ্চ নির্দেশনায় লিখেছেন :

প্রথম অঙ্কের বিচারালয়ের দৃশ্যের অবিকল নকল। জজ, উকিল, আসামি, পুলিশ, আবদুস সাত্তার, ভিখারিনী– প্রথম অঙ্কে যেখানে যে-ভাবে বসে বা দাঁড়িয়েছিল, এ-দৃশ্যে তেমনি সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবে। শুধু চাপরাশিকে দেখা যাবে না। তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রথম অঙ্কের দৃশ্যের সঙ্গে বর্তমান দৃশ্যের একটি বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হবে। সে-তারতম্য চারিত্রিক পার্থক্য। বর্তমান দৃশ্যের জজ পদমর্যাদাসচেতন সজ্ঞান ব্যক্তি, গুরুগম্ভীর কিন্তু সতর্ক, এবং নিঃসন্দেহে বিচারালয়ের সর্বাধ্যক্ষ। এক কথায়, সত্যিকার বিচারক। মঞ্চের সকলেই তার প্রতি সমীহশীল, এবং কারো ব্যবহারে শিথিলতা নেই।[৩৩]

নাটকের শেষ দৃশ্য পাঠককে স্বাভাবিক বাস্তব জীবনের বিচারালয়ে নিয়ে আসে। আদালতে উপস্থিত চরিত্রগুলো স্বাভাবিক আচরণ করে। প্রথম দৃশ্যের মতো এখানে কারও আচরণ ও কথায় শৈথিল্য নেই, বাড়াবাড়ি নেই। 'আব্দুস সাত্তার সাদাসিধা গ্রাম্য মৌলভি। বিচারালয়ের কায়দা-কানুন সে বোঝে না। বিচারকার্য তার কাছে নেহাতই রহস্যময় ঠেকে বলে জজের প্রতি ভীতি-শ্রদ্ধার অন্ত নেই।'[৩৪] শুধু আসামির কোনো পরিবর্তন দেখানো হয়নি। 'পূর্ব অঙ্ক দুটিতে সে যেমন মূঢ়ের মতো ভাবশূন্য মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবে।'[৩৫] এ দৃশ্যে আব্দুস সাত্তারকে মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেখানো হয়। আমেনার ফাঁসি হোক, এটাও সে চায় না :

আব্দুস সাত্তার : আশা করি আমার আরজিটা ইনকার করেন নাই। বড়ই গরিব মেয়েমানুষ। হাবাগোবা ধরনের। আসলে মাথা ঠিক নাই।

জজ : (নিরুত্তর। তবে মুখে এমন একটা ভাব জাগে যাতে এ-কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, প্রশ্নটা অনুচিত হয়েছে।)

পুলিশ : (সজোরে ইশারায় আব্দুস সাত্তারকে বসতে বলে।)

আব্দুস সাত্তার : (পুলিশের ইশারা লক্ষ্য করলে কিছু অনিশ্চিত ভাব আসে তার মধ্যে। তবু জজ কিছু বলে নাই দেখে দমিত না-হয়ে আবার) একই গ্রামের মানুষ। সৎ গেরস্থঘর, কিন্তু তারা বড়ই গরিব হুজুর। প্রায় অনাহারেই দিন কাটে।[৩৬]

বিচারব্যবস্থায় মানবিকতার অভাব ও বিচারব্যবস্থার সাথে জড়িতদের বোধশূন্যতা প্রথম দুই দৃশ্যে উপস্থাপনের মাধ্যমে নাট্যকার পাঠকদের এই মেসেজ দিতে চান, আমরা আসলে বিচারের নামে প্রহসন দেখি। অবাস্তব ও অস্বাভাবিক পরিবেশে বিচারিক কাজ উপস্থাপন করে নাট্যকার চরিত্রের গভীরতর জগতে দর্শকদের নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে কবীর চৌধুরী লিখেছেন :

আগের দৃশ্য গতানুগতিক অর্থে অবাস্তব কিন্তু গূঢ়তর অর্থে সত্য। নাট্যকার আমাদের নিয়ে যান নাটকের পাত্রপাত্রীর অবচেতন মানসলোকে। সে জগৎ বহুলাংশে অসম্ভব নাটকের জগৎ, স্বপ্ন আর বাস্তব যেখানে একাকার হয়ে যায়, চেনা চেহারা ভয়ঙ্কর ও বীভৎস হয়ে দেখা দেয়, অচেনা প্রতিভাত হয় অভূতপূর্ব নতুন আলোকে। শেষ দৃশ্যে বাস্তব পরিচিত আদালতের পট আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচারকসহ আদালতের সবাই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল চাপরাশির জন্য। সে জজ সাহেবের বাড়ি গেছে তাঁর ফেলে আসা চশমা আনবার জন্য। চশমা আনার পর জজ সাহেব এবার তাঁর রায় পাঠ করবেন। আমরা পুরোপুরি বাস্তবের পরিবেশে ফিরে আসি, যে পরিবেশ প্রকৃত অর্থে মোহান্ধ, যেখানকার সত্য শুধু অর্ধসত্য, অনেক সময়ই পূর্ণ অসত্য।[৩৭]

শেষ দৃশ্যের পরিবেশের সাথে পাঠক-দর্শক পরিচিত। এখানে যা উপস্থাপিত হয়, তা-ই সত্য। নাটকের শেষ দৃশ্য আমাদের আরেকটি সত্যের মুখোমুখি করে। চাপরাসির শেষ সংলাপ 'সাইকেলের কী দোষ? সেই মান্ধাতার আমলের জিনিস! না বদলালে আর চলবে না'[৩৮] আমাদের ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। সাইকেল এখানে জীবন, চলমানতা আর আমাদের সমাজব্যবস্থা কিংবা বিচারব্যবস্থার প্রতীক। সেই সাইকেলের চেন ছিঁড়ে গেলে জীবনের গতি থেমে যায়, সার্বিকভাবে সমাজচিত্র স্থবির হয়ে পড়ে। *ওয়েটিং ফর গডোর* দৃশ্য বিভাজনের সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহর এ নাটকের দৃশ্য বিভাজনের বেশ সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

ওয়ালীউল্লাহর আরেক নাটক সুড়ঙ্গর মধ্যেও অ্যাবসার্ডিটির স্পর্শ আছে। এক অঙ্কের এই নাটকটিকে নাট্যকার নিজে নাটিকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নাটকের ঘটনা ও সংলাপে অস্পষ্টতা আছে, আছে প্রতীকী বিষয় ও রহস্যময়তা। 'ছোটোদের জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কিছু লেখেন নি। তাঁর কিশোর-নাটিকা 'সুড়ঙ্গ' লেখা হয় 'বহিপীর'-এর পর-পরই, মধ্য-৫০-এ, কিন্তু পুস্তকাকারে বাঙলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৬৪ সালে।'[৩৯] ১৯৬২ সালে সুড়ঙ্গ নাটকের বিষয়ে নাট্যকার বলেন, 'নাটিকাটি প্রধানত কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা। তবে তরুণমনা বয়স্করা– যারা সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না, তারা এটি পড়ে বা দেখে আমোদ বোধ করবেন বলে আশা রাখি।'[৪০]

বিয়ের দুই দিন আগে রাবেয়া অসুস্থতার ভান করে পড়ে থাকে। কেন সে ভান করে তা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। মেয়ের 'অসুস্থতা' নিয়ে বাবা রেজ্জাক খুব চিন্তিত। অনেক হেকিম-কবিরাজ দেখানো হলেও কেউ রাবেয়ার অসুস্থতার কারণ বের করতে পারে না। রাবেয়ার সংলাপে এই অস্পষ্টতা পরিষ্কার :

...ঐ-যে আওয়াজটা হচ্ছে কাল থেকে, ঐ-যে ঠুকঠুক আওয়াজ ঘরের দক্ষিণ কোণে, সে-আওয়াজই-তো আটকে রেখেছে বিছানায়। সে-জন্যই-তো অসুখের ভান করতে

হচ্ছে। আমিই কেবল জানি কিসের ঐ আওয়াজ– কাঠঠোকরার মতো ঠুকঠুক সে-আওয়াজ, যার কথা কাউকে বলাও যায় না। একবার জানাজানি হলেই সে-রোমাঞ্চকর, রহস্যময় আওয়াজ একবারে থেমে যাবে।[৪১]

অবশেষে রেজ্জাক একজন ফকির ধরে নিয়ে আসে। লম্বা চুল, আলখাল্লা পরা কলিমকে রেজ্জাক চিনতে পারে না যে ফকির তার ভাতিজা। কলিম ফকির সেজে চাচার বাড়িতে আসে অন্য কিছুর লোভে। পাঠক ও দর্শক প্রথমত মনে করেন, বিয়ে ঠেকিয়ে রাখার জন্য রাবেয়া অসুখের ভান করে। কোথাও কারও সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। ফকির সেজে কলিম রাবেয়ার ঘরে প্রবেশ করলে এই ধারণা প্রবল হয়। ফকির ধরে নিয়ে এলেও রেজ্জাক ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস করে না। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে না থেকে রাবেয়া যে আওয়াজের জন্য উঠতে পারে না, সে আওয়াজ সুড়ঙ্গ কাটার। সুড়ঙ্গ কাটার কাজটি করে কলিমের বন্ধু। রাবেয়ার ঘরে মাটির নিচে গুপ্তধন আছে, এ রকম গল্প সে কলিমের কাছে শুনে থাকতে পারে। সে তারই বন্ধু কলিমকে ভুল নকশা দেয়। যুবক বিশ হাত লম্বা সুড়ঙ্গ কাটার কাজ করে। এদিক থেকে কলিম অনেক ভীরু। সুড়ঙ্গ কাটা কিংবা সুড়ঙ্গে ঢোকার সাহস তার নেই। কলিম তার বন্ধুকে সাপ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলে, 'গর্তে সাপ ঢুকেছে, বিষাক্ত সাপ। তাকে ধ্বংস করতেই হবে।'[৪২]

এসব কারণে সুড়ঙ্গটি খুব প্রতীকী হয়ে ওঠে। মনে হয় মানুষ নিয়ত মোহাবিষ্ট হয়ে সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে। এর শেষে কী আছে অথবা আদৌ কিছু আছে কি না, তা সে জানে না। যে গুপ্তধনের জন্য কলিম ছুটে আসে, যুবক দুই দিন ধরে সুড়ঙ্গ কাটে এবং রাবেয়াও শুয়ে থাকে এই ভেবে যে সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হলে গুপ্তধন মিলে যাবে, তা আসলে রেজ্জাকের বলা গল্প, মোহাবিষ্টতা। নাটিকার শেষের দিকে রাবেয়া ও কলিমের সংলাপ :

রাবেয়া : ...আমি যেন কেমন স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম গুপ্তধনের। দেখছিলাম, অনেক-অনেক সোনা-মোহর আলোতে ঝকমক করছে। দেখে যেন চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। মনে নেই আপনি গল্প বলতেন? বলতেন, জনরব যে আমাদের বাড়িতেই এমনি গুপ্তধন আছে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, সেটা যেন জনরব নয়, সত্যি। (এক নজর কলিমের দিকে চেয়ে) এ-সব গল্প সত্যি হয় না কেন? জনরব অত ভুয়ো হয় কেন?

কলিম : (স্তম্ভিতভাবে) গুপ্তধনের কথা তাহলে সত্যি নয়?

রাবেয়া : বোকার হদ্দ। এমন চমৎকার গল্প কোনোদিন সত্যি হয়?[৪৩]

নাটকের শেষে রাবেয়াকে সন্তুষ্ট মনে হয়। এটি মোহাবিষ্টতা থেকে মুক্তির আনন্দ হতে পারে। তবে *সুড়ঙ্গ* নাটকে ওয়ালীউল্লাহ একটি অপরিচিত ও অবাস্তব পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেন। এখানে কাউকে আমাদের খুব বেশি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মনে হয় না। সবাই লোভী, বাস্তবতাবর্জিত এবং সবাই সুড়ঙ্গ খুঁড়তে ব্যস্ত। *সুড়ঙ্গর* 'কাহিনীটি ধোঁয়াটে, সব কিছু পরিষ্কার বোঝা যায় না, ঘটনার গতিপ্রকৃতি রহস্যের আড়ালে ঢাকা থাকে। আর সমস্ত ঘটনা ঘটে একটা বিশ্বাসহীন আবহাওয়ার মধ্যে'।[৪৪] গুপ্তধনের মোহ বা লোভে এই নাটকের তিন যুবা চরিত্র রাবেয়া, কলিম ও যুবক মোহাবিষ্ট। এরা পরস্পরের প্রতি আস্থাহীন এবং একজন আরেকজনের বিশ্বাস ভঙ্গকারী। অথচ এই তিনজনের এ রকম অবাস্তব আর অলৌকিক কথায় বিশ্বাস করবার কথা নয়। তুলনামূলকভাবে রাবেয়ার পিতা রেজ্জাক অনেক বেশি বাস্তববোধসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক ও আধুনিক। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, নতুন প্রজন্ম কি তবে মোহাবিষ্ট, বিজ্ঞানচেতনা বিবর্জিত পশ্চাৎপদ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে? অধিকাংশ সময়ে এ রকম প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এর উত্তরে আমরা যা পাই তা আসলে ভীতিকর। আমরা এ রকম উত্তর কখনো কামনা করি না। তবে ষাটের দশকে শুরুতে ওয়ালীউল্লাহর বহুল আলোচিত নাটক *বহিপীর*-এ অ্যাবসার্ডিটির প্রভাব লক্ষ করা যায় না।

উপসংহার

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সংস্পর্শে এসেছে বাংলা নাটক। সেই শিল্পমাধ্যমের দ্বারা এ অঞ্চলের নাট্যকারগণ প্রভাবিত হয়েছেন এবং সেই দর্শন ও আঙ্গিকে নাটক রচনার চেষ্টা করেছেন। ফলে আবহমান বাংলার সমৃদ্ধ নাট্যধারা বা নাট্য আঙ্গিকগুলো খুব স্বাভাবিক গতিতে সামনে এগোতে পারেনি। অন্যদিকে বিভিন্ন সময়ে বাংলা নাটক অন্য সংস্কৃতির নাট্যদর্শন, আঙ্গিক এবং কোনো কোনো সময় বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হলেও অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এই প্রভাব বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ ও বেগবান করেছে।

বাংলা সাহিত্যের একজন দিকপাল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতো নাটকে তাঁর পূর্ণ প্রতিভার স্বাক্ষর না রাখলেও তাঁর লেখা চারটি নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। *তরঙ্গভঙ্গ* ও *সুড়ঙ্গ নাটক* দুটি পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে জন্মলাভ করা শিল্পচেতনা অ্যাবসার্ডিটি দ্বারা প্রভাবিত। দুটি নাটকেই তিনি অবাস্তব ও অস্বাভাবিক জগৎ তৈরি করেন। নাটকের চরিত্র এবং এদের কর্মকাণ্ড অবাস্তব ও অস্বাভাবিক। তবে এই অস্বাভাবিকতার পশ্চাতে নিগূঢ় সত্য লুক্কায়িত। ওয়ালীউল্লাহ *তরঙ্গভঙ্গ* নাটকে অসম্ভব পরিবেশে আমেনার স্বামী ও সন্তান হত্যার

বিচারের কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করেন। *সুড়ঙ্গ* নাটকে তুলে ধরেন এমন এক জগৎ যেখানে চরিত্রগুলো পরস্পরের প্রতি আস্থাহীন, লোভী ও মোহান্ধ। পঞ্চাশের দশকে ইউরোপের নাটকে আলোড়ন তোলা অ্যাবসার্ড দর্শন দ্বারা প্রভাবিত বলে ওয়ালীউল্লাহর এই দুটি নাটক বহুল আলোচিত।

লেখক পরিচিতি : **অনন্ত মাহফুজ (মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান)**, সহকারী পরিচালক (সহকারী অধ্যাপক), প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদনা), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), জুলাই ২০১০। পৃ. ৩৭৫

২. আহমেদ, সৈয়দ জামিল, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা* (১৯৯৫), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

৩. মাহফুজ, অনন্ত, *কথানাট্য : অতীত এবং সাম্প্রতিক প্রবণতা*, *থিয়েটার* নাট্য ত্রৈমাসিক, ৩২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগস্ট ২০০৩। পৃ. ১৬৭

৪. শাইখ, আসকার ইবনে, *বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি*, সাতরং প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬।

৫. ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদনা), পূর্বোক্ত। পৃ. ৪০৪

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রঙ্গমঞ্চ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০৪।

৭. মাহফুজ, অনন্ত, 'কথানাট্য : অতীত এবং সাম্প্রতিক প্রবণতা', *থিয়েটার* নাট্য ত্রৈমাসিক, ৩২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগস্ট ২০০৩। পৃ. ১৬৫

8. Esslin, Martin, *The Theatre of the Absurd*. London: Methuen Publishing Limited, 2001. 19p.

৯. চৌধুরী, কবীর, *প্রসঙ্গ নাটক*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৭।

১০. *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*. London: Penguin Books, Third Edition, 1992. 967p.

১১. চৌধুরী, কবীর, *সাহিত্য-কোষ*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১।

12. Camus, Albert, *The Myth of Sisyphus*. London: Penguin Books,1975, Reprinted 2000, 13p.

১৩. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯।

১৪. Ionesco, Eugene, 'Dans les armes de la ville*', Cahiers de la Compagnie*

Madeleine Renand-Jean Louis Barrault, Paris, no. 20, October 1957.
১৫. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*, পূর্বোক্ত।
১৬. পূর্বোক্ত।
১৭. Esslin, Martin, *The Theatre of the Absurd*. London: Methuen Publishing Limited, 2001, 26p.
১৮. চৌধুরী, কবীর ও কবীর, শাহীন (অনু.), *বেকেটের দু'টি নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ১৯৯৯।
১৯. শাইখ, আসকার ইবনে, পূর্বোক্ত।
২০. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*, পূর্বোক্ত।
২১. শাহরিয়ার, হাসান (সম্পাদনা), *থিয়েটারওয়ালা*, সপ্তম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৫।
২২. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*। পূর্বোক্ত।
২৩. মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা), *নাটক সমগ্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, প্রতীক প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৬।
২৪. পূর্বোক্ত।
২৫. পূর্বোক্ত।
২৬. পূর্বোক্ত।
২৭. পূর্বোক্ত।
২৮. পূর্বোক্ত।
২৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য*, মিনার্ভা বুকস, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮১।
৩০. মামুদ, হায়াৎ (সম্পা.), পূর্বোক্ত।
৩১. পূবোক্ত।
৩২. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*। পূর্বোক্ত।
৩৩. মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা), পূর্বোক্ত।
৩৪. পূর্বোক্ত।
৩৫. পূর্বোক্ত।
৩৬. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*। পূর্বোক্ত।
৩৭. মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা), পূর্বোক্ত।
৩৮. মকসুদ, সৈয়দ আবুল। পূর্বোক্ত।
৩৯. মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা), পূর্বোক্ত।
৪০. পূর্বোক্ত।
৪১. পূর্বোক্ত।
৪২. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*, পূর্বোক্ত।
৪৩. মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা), *নাটক সমগ্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ*, প্রতীক প্রকাশন সংস্থা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৬।
৪৪. চৌধুরী, কবীর, *এ্যাবসার্ড নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯।

Job Stress Among The Newspaper Reporters In Bangladesh

Kazi Nazmul Huda

Abstract

Though job stress is inevitable in every job, news reporters (NRs) of Bangladesh are encountering with different types of stressor in their profession. The study was designed to understand the impact of different stressor on job stress (JS) and portrays the relationship between the job stress and its stressors. The study is based on quantitative data collected through personal interview of 50 NRs of different newspapers of Bangladesh. The study revealed" Family Pressure" and" Inadequate Compensation" as the most significant stressors. The author has recommended immediate implementation of Wage Board and need based Employee Assistance Program to make this noble profession free from stress. This study will aid to confer, discuss, and endeavor to develop stress management policies in this sector.

Keywords: Job stress, Stressors, Stress management, Journalism, News reporter

1.0 Introduction & Significance of the Study

Job is an important part of our life and stress related to job is inevitable (Huda & Kalam, 2015:79). There is an unyielding relation between job stress and job performance (Bradley & Sutherland, 1994:4). In a high performing corporate culture, job stress has become an obvious factor for both employers and

employees and must be attained with due diligence. Job stress situation causes different kinds of physiological, psychological, and behavioral symptoms and Tarkovsky (2007) termed the stressors as "the silent killer" if not managed properly. It is the responsibility of the organizations to deal with the job stress situation and should take honest endeavor to minimize the impact of stressors to keep their employees productive (Huda & Kalam, 2015:79). However, professionals should be well-informed about the causes of job stress (stressors) to tackle the stressful situation of life. Stress occurs when people find inconsistency between their professions; different stress factors of work life create pressures and anxiety (Maslach, 2003:189). Prolonged stress may cause an extraordinary burnout situation at work life and may lead to some negative consequences resulting in negative self-image and different symptoms of stress (Caputo, 1991: 5).

The press serves the role of delivering new information quickly, accurately, and consistently (Sang-young & Cho, 2014:11). By the revolutionary initiative of the father of Bangladeshi Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, print media of Bangladesh has grown rapidly and is currently playing a significant role to uphold the norms of democracy, maintain good governance and resourceful education, sports and entertainment. Since 1992, the industry witnessed a significant qualitative and quantitative change. According to the Department of Films and Publication (2017), there are 1248 enlisted news papers operating all over Bangladesh. News is a common product of the majority of news papers and due to more competition in the market (Azad & Hussain, 2016:56) stress is fairly visible among news reporters.

Newspaper is the most effective media in unleashing peoples' voice to the world and the news reporters are fighting day and night with their pen. But according to many researcher like Alterman (2006:10) and many others news reporting is a catastrophic occupation and has become one of the most stressful careers that has to deal with deadlines, busy work environments, tight schedules, extensive travelling, fulfilling the demands of the editors, and the fear of being killed and laid off (Shmoop, 2014).

The profession is rated as the top ten stressful jobs amongst all the professions in the world and facing a shrinking job market (Shapley, 2013). A large number of news reporters in Bangladesh had complained that they could not even report fair news by the threats and pressure of employers and affected parties (Azad & Hussain, 2016:56). News reporters are often subject to dangerous and life threatening situations and encounter considerable amount of psychological pressure besides other stresses i.e. work overload, and job insecurity.

When job stress takes a massive shape, it affects the performance of the organization, turns down the quality of individual productivity, deteriorates physical condition, weakens social relations, and ruins family life. Stress at work is inevitable in today's high performing and competitive corporate culture. However, active interventions may minimize the level of stress to bring a balance between work and life (Baker, 1985: 367). It is the responsibility of the employers and employees to identify the causes of job stress and should measure its impact on performance to maintain a healthy and productive work life and to avoid the negative consequences. Existing studies have hardly succeeded in finding out the authentic elucidation of stress, and rarely provided ideas to mitigate stress at work (Teasdale, 2006:251). This paper intends to minimize the gap.

The study embarks to address the specific causes of stress (stressors) of news reporters (NRs) of Bangladeshi news papers and endeavors to reveal their opinions about the stressors of their profession.

2.0 Objectives of the Study

2.1. To examine the impact of different stressors on overall job stress situation of the NRs.

2.2. To explore the relationship between overall job stress situation with different stressors.

3.0 Literature Review

Job stress could be a chronic life-threatening syndrome raised from

work conditions that may negatively influence employees' productivity and personal well-being. According to The World Health Organization, (1948:100) stress is the state of comprehensive physical, mental, and social illness in a person. Though, no Profession is stress free; and has some degree of strain, and anxiety that could result in productivity and satisfaction at work or may lead negative results like mental and physical illness if the stress is excessive (Teasdale, 2006:251). Job stress is considered as the foremost cause of a wide range of health problems (Kivimaki et al., 2006:431), and it is strongly linked to staff turnover, absenteeism, poor motivation and productivity (Noblet & Lamontagne, 2006:346). Increasing level of job stress can damage the reputation and financial state through serious legal allegation, compensation claims, disciplinary issues, and workplace violence (Babcock, 2009). According to Canadian underwriter (2004), factors that causes job stress, include conflict and friction among the colleagues. Friedman et al., (2000:32) coined bulling, insecurity as stressors. Lack of freedom at work mostly in free decision making can be an impactful stressor and some personal issues i.e. family pressure, financial constrains abuse etc (University of Cambridge 2014). Stress at work could be generated out of fear of uncertainty, unrealistic deadlines and interpersonal conflict (Babcock, 2009). Job stress frequently occurred by long working hours may cause cardiovascular attack (Uehata, 1991:147). It also impedes family life and creates psychological distress (Major et al., 2002:427). In most of the times, bullying and organizational incivility are one of the most upsetting issues for the employees (Gholipour, et al., 2011:234), that might be caused by allegation, rudeness, frightening, malevolence, insult which directs to aggravation, threat, disrespect, and deterioration of self-confidence (Lee, 2000:593). However, the more common psychological job stressors are anxiety, and depression that negatively impacts work environment (Teasdale, 2006:251). As stated in the U.S Department of Health, job stress is harmful physical and emotional responses when the job description of a job does not match the capabilities, resources, or needs of the

employees. The fight to stabilize the work and family life is purely one of the many stressors that an employee faces at work (Tyler, 2006). In many cases job stress is created by the pressure of unethical conduct (Glicken, 2013). To combat the stress, the managers must audit and acknowledge the presence of stress at workplace and should undertake stress management interventions to reduce the levels of stress of their employees. (Sidle, 2008:111). According to Jones et al, (2003), it is found that stress management interventions improve physical and mental health; reduce costs of the employers; facilitate the reintegration of affected employees into workplace and it is an integral component of health promotion program of an organization (Kobayashi, 1997:66). There are three broad categories of stress management interventions exposed by Ivanevich et al., (1990:252) i.e. reducing the current stressors, identifying the employees under stress and aiding the employees to adjust with the situation that causing stress. DeFrank and Cooper, (1987:4) recommended, stress management as individual interventions like relaxation and autonomy at work. Stress management techniques could be divided into two types: environmental management (Murphy, 1999:149) which is an endeavor to organize work environments to reduce the causes of stress; and the approach that aids the employees to deal efficiently with various types of stressful condition (Hardy & Barkham, 1999:247). Physical and mental health is a potential source of work related injury or disease and both the employer and employee have the lawful right, responsibility and accountability to help each other to identify, acknowledge and mitigate stress and stressors to ensure sustainable productivity and workplace harmony.

Many research results has shown that news reporters develop different types of psychological problems out of depression and stress disorder (Pyevich et al., 2003:325).

An empirical study by Bernard et al., (1994: 417) provides evidence that, increased work load and long working hours causes different physical symptoms of job stress. Another research results signify that the young and entry level news reporters suffers from burnout which is an extreme result of job stress (Reinardy, 2011:33).

McQuarrie, (1999:20) have coined that; job dissatisfaction is a major cause of job stress that may lead to frequent absenteeism at work and high rate of employee turnover. According to South Asian Journal (2012), news reporting is one of the hazardous professions in Bangladesh and NRs are subject to physical, mental and legal abuse. Current literature shows clear evidence of negative impacts of stress in work life and news reporters are under job stress. However, most of the research works are qualitative in nature and lack of empirical research keeps a gap in this research area.

Table# 1: Important Stressors of Job stress Stressors

Stressors (Independent Variables)		**Code**	**Source**
1	Unclear Work Objective	Objective	Semmer, (2007) and Bacharach et al., (1990: 199).
2	Excessive Time Pressure	Time Pressure	Semmer, (2007), McQuarrie, (1999:20), and Bacharach et al., (1990).
3	Unachievable Deadline	Deadline	Turnage & Spielberger, (1991:165). University of Cambridge (2014),
4	Long Working Hour	Work Hour	Sethi et al., (2004:99), Uehata, (1991:147) and University of Cambridge (2014),
5	Work Overload	Overload	Sethi et al., (2004:99), Semmer, (2007). University of Cambridge (2014), McQuarrie, (1999:20) and Bacharach et al., (1990: 199).
6	Work very fast	Fast	Sethi et al., (2004:99), Major et al., (2002:427).
7	Lack of Freedom at work	Freedom	University of Cambridge (2014) and Canadian underwriter (2004),
8	Inadequate Support	Support	Semmer (2007), Reinardy (2009:126), Bacharach et al., (1990: 199).
9	Workplace Harassment	Harassment	Semmer, (2007).
10	Friction among the colleagues	Friction	University of Cambridge (2014), (Friedman, et al., 2000:32).
11	Pressure to do un ethical work	Ethics	Ulrich et al., (2007:1708), Glicken, (2013)
12	Insufficient Compensation package	Compensation	Canadian underwriter (2004), McQuarrie, (1999:20), Reinardy, (2009:126), Bacharach et al., (1990: 199).
13	Unmanageable Family life	Family	Major, et al., (2002:427), Canadian underwriter (2004), Bacharach et al., (1990: 199).
14	Risk of life	Life threat	(Zakaria & Azad, 2009)
15	Lack of Job Security	Job security	Semmer, (2007), University of Cambridge (2014), Reinardy, (2006:397), Bacharach et al., (1990: 199).

Source: Literature Review

4.0 Research Methodology

The methodology of this study has been designed in accordance to the objectives of the research. The study is descriptive in nature that followed inductive research approach and a survey based research strategy. The methodological choice of the research is both qualitative and quantitative. The survey intervenes to collect required information and data through structured questionnaire. An extensive literature review was conducted to identify the most common variables (Stressors) (Table 1) and the questionnaire was

developed based on those identified variables. Total 50 news reporters of different daily news papers were interviewed randomly with a view to making the study informative and representative and a close ended questionnaire survey was conducted. The questionnaire contains 15 questions and a 5-point likert rating scale *(5 strongly agree ...1 strongly disagree)* was used to obtain the opinion of the respondents about important determinants of job stress. The respondents were mostly fulltime news reporters who are permanently employed in this sector for last five years. SPSS 20 is used for data analysis and the survey was carried out during 1st October to 8th November of 2017.

Influential stressors of overall job stress have been identified by considering the Standardized Coefficients of each variable (Table 2). The results of coefficients analysis will discover the relationship between dependent and independent variables (Table 2). Higher value is considered as highly influential stressors and vice versa. The respondents were asked about their feelings of job stress in terms of the variables i.e. are they clear about their job objectives? Do they feel time pressure? Are they overloaded with responsibilities? Is there a friction among the peers? About their feelings of job security, Are they under life threat? Do they feel any difficulties in managing family life? etc. Apart from the structured questionnaire survey, an in-depth discussion was arranged with the senior NRs and Leaders of Press Club with the aim to discover the clues for remedial measure to combat stress. Their ideas are projected in recommendation part.

The conceptual model of the Job stress (JS) is given below

Overall job stress (JS) = $A + B_1$ *Objective* + B_2 *Time Pressure* + B_3 *Deadline* + B_4 *Work Hour* + B_5 *Overload* + B_6 *Fast* + B_7 *Freedom* + B_8 *Support* + B_9 *Harassment* + B_{10} *Friction* + B_{11} *Ethics* + B_{12} *Compensation* + B_{13} *Family* + B_{14} *life threat* + B_{15} *Job security*

5.0 Scope and Limitation of the Study

The author has tried his best to cover up many issues regarding the job stress of the news reporters of Bangladesh. However, the study

has some limitations too. Major limitation of the study is the scope of the research, as the area does not cover all the news paper of Bangladesh due to time and budget constrain of the researcher. The sample size was limited to 50 as the research was supposed to be completed in a limited period. The demographic data of the respondents, i.e. age, gender, and others are not considered in the study. The researcher was bias to theories of stress management only to develop the model of the research and interpretation & analysis of the data were organized in accordance to that. The possibility of respondents' responses being biased cannot be ruled out too.

6.0 Findings and Discussion

6.1. Results of Regression analysis

The results on the regression test revealed that R-value which shows overall fit of the model is 0.872. This is an indication of significantly satisfactory fit of the model (as suggested by Hair et. al., (2016:414). In addition, the overall model is significant with F =7.17 at p = 0.00. Thus, it can be argued that the proposed regression model is strong enough to explain the items that affect job related stress.

Proposed model based on results

Overall job stress (JS) = *-1.526 + .289 Objective + .236 Time Pressure + .409 Deadline*
(2.811; 0.008) (-3.836; 0.044) (3.171; 0.003)

+ .166 Work Hour + .102 Overload + .325 Fast - .219 Freedom + .061 Support
(1.184; 0.024) (-3.659; 0.014) (2.027; 0.051) (-1.523; 0.013) (4.408; 0.008)

+ .116 Harassment + .238 Friction + .140 Ethics + .504 Compensation + .642 Family
(-2.829; 0.004) (1.757; 0.048) (1.777; 0.003) (3.399; 0.005) (5.233; 0.000)

+ .444 life threat -.159 Job security
(-2.661; 0.012) (-1.121; 0.041)

6.2. Results and discussion of Coefficients analysis

Table 2: Coefficients

Model		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	(Constant)		-1.845	.074
	Objective	.298	2.811	.008
	Time Pressure	.236	-3.836	.044
	Deadline	.409	3.171	.003
	Work Hour	.166	1.184	.024
	Overload	.102	-3.659	.014
	Fast	.325	2.027	.051
	Freedom	-.219	-1.523	.013
	Support	.061	4.408	.008
	Harassment	.116	-2.829	.004
	Friction	.238	1.757	.048
	Ethics	.140	1.177	.003
	Compensation	.504	3.399	.005
	Family	.642	5.233	.000
	Life threat	.444	-2.661	.012
	Job security	-.159	-1.121	.041

Source: Author's own calculation (SPSS 20)

According to the results of coefficients analysis, the relationship between dependent variable (job stress) and the independent variables (stressors) are revealed. Total 02 independent variables out of 15 are found with negative relationship with the dependent variable.

According to the analysis variable "Family Pressure" shows positive relations with the highest coefficient value .642. It means the variable is having 64.2% influences on JS. However, the level of significance of the data is also found highly significant (.000). This situation may be caused by the stressors "Insufficient Compensation Package". As the coefficient value of this stressor is the second highest, .504. According to the result, these two stressors seem parallel to each other and at the time of discussion, most of the NRs have opined that their family life is unmanageable due to insufficient pay. They cannot give sufficient time to their

family members as most of them are engaged in secondary profession besides news reporting. The truth of this outcome is evident as the data of the Department of Films and Publication (2017), shows that, only 91 out of 1248 newspaper have implemented the latest wage board set by Government.

From the results, it is also made clear that "life threat" also acts as a significant stressor and shows the third largest coefficient value (.444) with acceptable level of significance (.012). Most of the NRs under the anxiety of "life threat" when they are reporting crime, corruptions and other social malpractices. Zakaria & Azad, (2009); Huda & Azad (2015:79) and many other news report supports the result. The variable "Unachievable Deadline" is found as the fourth most influential and significant variable as the relationship with JS is positive with highly significant value (.409). This may happen as the NRs of daily news paper are always kept under pressure to finish their assignment within short period of time. "Fast work" with an influential value of .325 is found as an important stressor to the NRs. This outcome is also corresponding with the previous result, as the NRs face unachievable deadline; they are forced to finish the assignments by working fast. Unclear objective is found as an influential stressor after fast work. Its coefficient value is .298 with a very acceptable level of significance (.008). The outcome is little ambiguous as most of the NRs opined that, they are assigned with very specific objective and scope. Their role and responsibilities are according to the category of news items. Coefficient value of "friction" is .238. While conversing with the NRs they avowed that they have friction among them as they are divided by many political values. It is pretty obvious that "Excessive Time Pressure" is an influential stressor (.236) as the NRs accomplish their assignments by working fast within an unfeasible deadline. Long Working Hour is comparatively less influential stressor with the coefficient value .166 and .024 level of significance. The result is also corresponding to the value of previous stressor "Excessive Time Pressure". NRs mostly work outdoor during day time to collect news and prepare the report at the evening time till the news is sent for print. Pressure for

unethical conducts is also a less influential stressor of JS with the coefficient value .140 and .003 level of significance. Though the job of news reporting is subjected to life threat according to the opinion of many NRs, employers do not put pressure for unethical reporting or to censor the truth. According to research output, harassment at work is among the less influential stressor of JS with the coefficient value .116 and .004 level of significance. According to the NRs, there is no harassment by the employers but in most cases they are harassed by a few political fanatics and some imprudent members of law enforcing agencies. Although the NRs feel time pressure and work under taut deadline, their work load is fairly justified. The outcome of this study is counteracting with the result of the study. The stressor "Inadequate Support" is at the bottom of the list with the lowest and insignificant coefficient value .061. Most of the NRs stated that their supervisor provide adequate support to finish their assignment.

According to the result, two stressor are showing inverse relationship with JS. It is quite predictable relationship between this two independent variable with dependent variable JS as freedom (-.219) at work decreases stress will definitely increase and also same at the case of job security (-.159) variable. According to the discussion with the senior reporters it was marked that, they enjoy freedom at work, but their job is not secured by employee retention program and financial incentive plan.

7.0 Policy Prescription

In this study it is revealed that Job stress of the NRs are mostly determined by stressors like, family pressure, inadequate compensation, life threat, and job security. To encounter this situation comprehensive approach could be taken by the government agencies and top management of the newspaper companies in design effective actions in managing job stress of the NRs. Following are some specific guidelines in this regard.

7.1. Tailored stress management programs: Newspaper companies must take some customized stress management

initiatives like stress reporting & auditing, job redesign, grievances management program, counseling, meditation and psychotherapy to bring ability in this noble profession and support the NRs to cope with the stressors. This type of interventions were also coined by Sidle, (2008:111) his research paper. At the beginning of the stress management project, awareness program on stress management could be organized to aid the management and the NRs to take control over their work and life stressors. Stress stabilizing program should be initiated to sustain the process continuity of the stress management project through periodic stress audit and feedback. Huda et al., (2016:51) also suggested the same in their research article.

7.2. Employee Assistance Program: EAP is kind of an employer led initiative to provide a little help to the stressful employees in managing their personal lives. This may encourages a supportive culture among the NRs through promoting team work in their profession. NRs could be empowered with greater flexibility in decision-making and due assistance to attain their objective without stress. Effective teamwork will allow the NRs to share responsibilities, to respects the priorities of the colleagues and develop a caring and supportive environment to accomplish stressful assignments. Huda & Kalam, (2015:79) and Bradley & Sutherland, (1994: 9) had suggested to conduct training on teambuilding and relaxation in this regard. Relaxation program like outdoor family events may help the NRs in combating stress. Other EAP program like recreations facility at workplace, family events, friendly work environment, recognition, and reward for their wellness may be included to promote a stress free culture at workplace. To bring a balance in work and life Teasdale, (2006:251) suggested introducing employee concierge service to help busy employees to make their family life easy. This service may include household services, and onsite medical care, utility bill payment, repair services, banking services, legal advice services etc to reduce off-the-job concerns, increase on-the-job focus, and company loyalty, to balance work and personal lives

and enjoy hassle free and peaceful life. Some of the government organization Bangladesh like military services, organizations under petroleum corporations, port authorities are provided with these types of services. Press Club, the association of the journalists in Bangladesh may take some measures to help the NRs by taking programs like counseling, advocacy program, policy formulation to reduce stress and mainly a unified service rules for the journalists to promote better human resource management practices in this profession (Huda & Kalam, 2015:79).

7.3. Social Security Program: Government should undertake protection programs for the NRs by providing security by law enforcing agencies. The NRs killed in the line of duty should be provided with justice and their family members should be taken under governmental rehabilitation program. Most of the NRs are strongly prioritizing the implementation of wage board by the Government as an effective intervention of stress management. Implementation of eighth wage board by employer will make 75% increases in the salaries of the NRs.

8. Conclusions

NRs are playing a pivotal role in promoting democracy, human rights, good governance, and other social issues. So, their stress in the professional life should be assessed with due diligence. Employers in this sector must be aware about the vulnerability of excessive stress and how it affects human immune system, inner potentials, and productively leading to loss in business. This study finds the presence of job stress among the Bangladeshi news reporters with a significant value. However, the job stresses of NRs are largely dependent on insufficient compensation and benefit and life threat. Harassment and less support do not come as an important stressor in this profession but they usually are harassed by external bodies. However, the NRs should be provided with EAPs to combat job stressors. It is very apparent that news reporting has become a very critical profession. In search for news stories, they need to see, write, and witness many unpleasant

incidents that could be stressful and may end with life threatening consequence of their life. A well thought-through, proactive approach of job stress management could be organized by the government agencies, press unions, and other stakeholders to decide and design a helpful mechanism to combat stress and to make this challenging profession stress free, productive, and enjoyable.

The concept of job stress and its major stressors are the significant and demanding issues of research in Human Resource Management and Development. Further research with larger scope, time and budget may contribute to determine the outcomes of stress of NRs, its impact on their individual job performance, organizational productivity and profitability.

Writer : **Kazi Nazmul Huda,** Associate Professor, Department of Business Administration, Southern University Bangladesh,

Reference

Azad, A. K. & Hussain, S. (2016). Television Journalism in Bangladesh, IBS Journal, Bangladesh: Institute of Bangladesh Studies, 23.

Alterman, E. (2006) The end of Times? The Nation, 13 November, p. 10.

Baker, D. B. (1985). The study of stress at work. Annual review of public health, 6(1), 367-381.

Bernard, B., Sauter, S., Fine, L., Petersen, M., & Hales, T. (1994). Job task and psychosocial risk factors for work-related musculoskeletal disorders among newspaper employees.

Scandinavian journal of work, environment & health, 417-426.

Caputo, J. (1991), Stress and Burnout in Library Service, Oryx Press, Phoenix, AZ. 5

Canadian underwriter (2004), Stress from workplace conflict, 40. www.canadianunderwriter.ca

DeFrank, R. and Cooper, C. (1987), "Worksite Stress Management

Interventions: Their Effectiveness and Conceptualization", *Journal of Managerial Psychology,* 2 (1), 4-10.

Friedman, R. A., Tidd, S. T., Currall, S. C., & Tsai, J. C. (2000). What goes around comes around: The impact of personal conflict style on work conflict and stress. *International Journal of Conflict Management,* 11(1), 32-55.

Gholipour, A., Sanjari, S., Bod, M. and Kozekanan, S. (2011), Organizational Bullying and Women Stress in Workplace, *International Journal of Business and Management,* 6(6), 234.

Glicken, M. D. (2013). Treating Worker Dissatisfaction in a Time of Economic Change, Elsevier

Hardy, G. & Barkham, M. (1999) Psychotherapeutic interventions for work stress. In: Firth-Cozens J, Payne RL, eds. Stress in health professionals: psychological and organizational causes and interventions. Chichester: John Wiley & Sons,:247–59.

Huda, K. N., & Azad, A. K. (2015). Professional stress in journalism: a study on electronic media Journalists of Bangladesh. Advances in Journalism and Communication, 3(04), 79.

Huda, K. N., Shah, M. G. H., & Nasrullah, A. M. (2016). Workplace Stress and Consciousness of Bankers In Bangladesh: A Study On Private Banks In Chittagong. Journal of Asian Business Management, 8(1) 51-66,

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications, 414-433.

Ivanevich, J., Matteson, M., Freedman, S. and Philips, J. (1990), "Worksite Stress Management Interventions," *American Psychologist,* 45 (2), 252-261.

Kivimaki, M., Virtanen, M., Elovainio, M. (2006), Work stress in the etiology of coronary heart disease-a meta analysis, *Scand J Work Environ Health,* 32, 431-42.

Kobayashi, (1997) Japanese perspective of future work life, *Scand Journal of Work Environment Health,* 23, 66-72.

Lee, D. (2000). An analysis of workplace bullying in the UK. *Personnel Review,* 20(5).593 – 610.

Murphy, L. (1999) Organizational interventions to reduce stress in health care professionals. In: Firth-Cozens J, Payne RL, eds. Stress in health professionals: psychological and organizational causes and interventions. Chichester: John Wiley & Sons, 149–162.

Maslach, C. (2003), "Job burnout: new directions in research and intervention", *Current Directions in Psychological Science,* 12 (5), 189-92.

Major, V. S., Klein, K. J., & Ehrhart, M. G. (2002). Work time, work interference with family, and psychological distress. *Journal of applied psychology,* 87(3), 427.

McQuarrie, F. (1999). Professional mystique and journalists' dissatisfaction. Newspaper research journal, 20(3), 20-28.

Noblet, A., and Lamontagne, AD. (2006), The role of workplace health promotion in addressing job stress, *Health Promotion International,* 21, 346-53.

Pyevich, C. M., Newman, E., & Daleiden, E. (2003). The relationship among cognitive schemas, job-related traumatic exposure, and posttraumatic stress disorder in journalists. Journal of Traumatic Stress, 16, 325–328. doi:10.1023/A:1024405716529

Reinardy, S. (2011). Newspaper journalism in crisis: Burnout on the rise, eroding young journalists' career commitment. Journalism, 12(1), 33-50.

Sidle, S. (2008), Workplace Stress Management Interventions: What Works Best? Academy of Management Perspectives – 111.

Sang-young, P.& Cho, S.(2014). Effects of journalists' job stress factors on physical conditions, *Advanced Science and Technology Letters,* 72, 11-15

Semmer, N. K. (2007). Recognition and Respect (or lack thereof) as predictors of occupational health and well-being. Paper presentation at World Health Organization, Geneva.

Shmoop (2011) http://www.shmoop.com/careers/journalist/stress.html

Shapley, L. (2013). Most stressful jobs: Journalism careers make 2013 list, The Denver Post, April 16. http://blogs.denverpost.com/editors/2013/04/16/media-jobs-make-list-of-top-stressful-careers-of-2013/857/

South Asian Journal (2012). Journalism in Bangladesh: a Stricken Path, October 2 http://southasiajournal.net/journalism-in-bangladesh-a-stricken-path/

Tyler, K. (2006), Restructuring policies and workloads, along with providing training and support services, can help reduce employee stress. HR Magazines -80

Tarkovsky, S. (2007). Professional Stress - All You Need to Know to Beat It, *ezinearticles.com,* January 28. http://EzineArticles.com/434206

Turnage, J. J., & Spielberger, C. D. (8 1991). Job stress in managers, professionals, and clerical workers. Work & Stress, 5(3), 165-176.

Teasdale, E. L. (2006). Workplace stress. Psychiatry, 5(7), 251-254.

Uehata, T. (1991). Long working hours and occupational stress-related cardiovascular attacks among middle-aged workers in Japan. Journal of human ergology, 20(2), 147-153.

University of Cambridge (2014), The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge CB2 1TN, 29 November, http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/policy/stress/causes.html

World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 states (Official Records of the World Health Organization no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. The definition has not been amended since 1948.

Zakaria, M. & Azad, A. K. (2009), Journalism as a profession in Bangladesh: An Overview, The Chittagong University Journal of Arts and Humanities, Vol XXII.

Community Radio
An Important Tool to Establish Digital Bangladesh

Md. Abu Sayem

Executive Summary

Community radio is a kind of local broadcasting arrangement which gets set up and operated by a fixed community for its well-being. Community radio was first introduced in Bolivia in 1948 and Nepal is the first country in South Asia to set up local broadcasting system in 1997. In Bangladesh, Community Radio, in particular can play not only supportive roles in achieving the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs), but also can contribute to create new opportunities of development. The objectives of the study are to know the present scenario of Community Radio in Bangladesh, understand the status and practices of Community Radio in other countries and explore the potentiality of Community Radio for information dissemination to establish Digital Bangladesh. This is a fully exploratory research work. All the data that were used to prepare the manuscript were taken from various secondary sources. Bangladesh is now on an active way to proceed to the Community Radio (CR) broadcast. Ministry of Information approved 32 Community Radios for installation, broadcast and operation in Bangladesh. In Mozambique, a Community Radio is effectively supporting the Ministry of Health. In Brazil, Community Radio is a key communication and information dissemination channel within the

municipalities. In Nepal, "Radio Sagarmatha" a popular community radio, plays an instrumental role by bringing issues that affecting lives of women and children. Community Radio has a potentiality of empowering backward community, achieving Sustainable Development Goals, awareness building about public services, assisting rural farmer, ensuring citizen charter, bridging the gap between rural and urban area, non-payable information, alert against natural disasters etc. The potentiality of Community Radio contained in this study could help the policymaker craft strategic plans to bring the dream of a Digital Bangladesh come true. So, there should be clear and explicit recognition of community broadcasting as a distinct sector.

1.0 Introduction

Community radio is a kind of local broadcasting arrangement which gets set up and operated by a fixed community for its well-being. A Community Radio (CR) is operated by a group of communities. These communities may consist of women, children, tender, aged, physically challenged, farmers or businessman. Community radio was first introduced in Bolivia in 1948 (BNNRC: 2009). That was set up to protest against poverty and social injustices. In South Asia, Nepal is the first country to set up local broadcasting system in 1997 (NEFEJ: 2004).

Bangladesh has experienced the contributions of Bangladesh Betar, state-run radio to the country's development initiatives, socio-cultural, political and economic growth and integration. Over the decades, radio has been playing a key role. There are, however, limitations in the operation of mainstream radio to cater for the needs of various segments of population, particularly community people. In order to overcome the practical constraints, Community Radio stations were established in different regions of the world (Reza, 2008).

Community radio, in particular can play not only supportive roles in achieving the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) and Seventh Five Year Plan, but also can contribute to create new opportunities of development. Community Radio has a

great potentiality to contribute in the development of agriculture, education, health, women empowerment, environmental issue, small entrepreneurship, natural disaster management, trade, marketing etc. of a particular community.

2.0 Objectives of the study

Considering the facts following objectives are considered-

- To know the present scenario of Community Radio in Bangladesh.
- To understand the status and practices of Community Radio in other countries.
- To explore the potentiality of Community Radio for information dissemination to establish Digital Bangladesh.

3.0 Scopes and Limitations

Though the report is focused on the potentiality of Community Radio in Bangladesh, large scale survey is beyond the scope of this study. This report is extensively dependent on secondary data sources. Primary information in investigating the report findings is difficult for time constraints.

4.0 Methodology of the study

This is fully exploratory research work. All the data that were used to prepare the manuscript were taken from various secondary sources. Different books, seminars, journals, published materials of BNNRC, websites etc. were the sources of data.

5.0 Present Scenario of Community Radio

5.1 Present Scenario of Community Radio in Bangladesh

It is appreciated that opening the arena of right to information for the rural people of Bangladesh through establishing community radio stations was declared in the 2008 manifesto of Bangladesh Awami League- "Initiatives will be taken for community radio services, besides national radio network" (Article No. 19.1 of the Charter for Change).

Bangladesh is now on an active way to proceed to the Community Radio (CR) broadcast as the Government has approved "The

Community Radio Installation, Broadcast and Operation Policy-2017" (Bangladesh Gazette, 2018) by cancelling the existing Community Radio Installation, Operation and Broadcast Policy-2008 (Bangladesh Gazette, 2008). To ensure free flow of information and people's right to information, government enacted Right to Information Act 2009. Community Radio approval is a strong step to empower rural people in this regard.

Ministry of Information of People's Republic of Bangladesh announced for application on 18 March, 2008. So far under the policy, Ministry of Information approved 17 Community Radios for installation, broadcast and operation in Bangladesh and more 15 Community Radios are under pipeline (February, 2018). At present, government approved 17 initiators like Radio Sagar Giri FM 99.2 for Sitakunda (Chattogram), Radio Nalta FM 99.2 for Satkhira, Radio Mukti FM 99.2 for Bogura, Radio Pollikantha FM 99.2 for Moulivi Bazer, Borendro Radio FM 99.2 for Naogaon, Radio Mahananda FM 98.8 for Chapai Nawabganj, Radio Padma FM 99.2 for Rajshahi, Radio Jhenuk FM 99.2 for Jhinaidhah, Radio Bikrampur FM 99.2 for Munsihiganj, Lokobetar FM 99.2 for Barguna, Radio Chilmari FM 99.2 for Kurigram, Radio Sundarban FM 98.8 for Koyra (Khulna), Radio Naf FM 99.2 for Teknaf (Cox's Bazer), Krishi Radio FM 98.8 by Agriculture Information Service (AIS) for Amtoli (Barguna), Meghna FM 90.0 for Charfession (Bhola), Radio Sagor Dwip FM 99.2 for Hatiya (Noakhali) and Radio Sarabela FM 98.8 for Gaibandha. The seventeen Community Radios have been broadcasting 144 hours radio programs and news regularly.

Scenario of Community Radio in Other Countries

5.2.1 Experiences from Africa:

In Mozambique, a community radio network comprised of 72 stations is effectively supporting the Ministry of Health in EPI, cholera prevention, breastfeeding, hygiene promotion.

5.2.2 Experiences from Latin America:

In Brazil, community radios are supporting the Government and civil society on key social issues by broadcasting programs and debates on- local platform for children (municipal competition),

early childhood development, primary education, child labor, prevention of sexual exploitation and abuse. It is a key communication and information dissemination channel within the municipalities (there are more than 5,000 municipalities).

5.2.3 Experiences from Asia:

In Indonesia, community radios are playing a critical role in disaster preparedness and improving basic services to women and children. In Nepal, "Radio Sagarmatha" a popular community radio, plays an instrumental role by bringing issues that affecting lives of women and children. In India, "Namma Dhawani and Voices" are popular community radios promote issues like education, health and local development etc. A UNICEF supported child rights based community radio programme on adolescents is very popular (De Souza, 2010).

6.0 Potentiality of Community Radio to Establish Digital Bangladesh

6.1 Empowering backward community:

The main objective of community radio is to serve the backward community or socially excluded groups

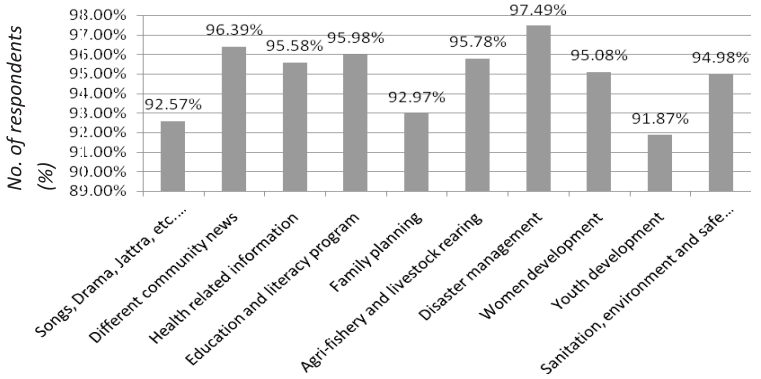

Figure 1: Program that wants to listen from Community radio (Source: Alam, 2009).

In Figure 1, baseline survey from 10 districts of Bangladesh reveals that programs want to listen from community radio include songs, drama, jattra, etc. as recreational program, different community news, health related information, education and literacy program, family planning, agro-fishery and livestock rearing, disaster management, women development, youth development, and sanitation, environment and safe drinking water. More than 90 per cent of the respondents supported all these programs. It means, all these programs may be broadcasted from the community radio. Through taking part in various programs in community radio, backward people can gather necessary information.

6.2 Utility of Community Radio for Achieving Sustainable Development Goals and Seventh Five Year Plan:

It is well documented that Community Radio can effectively be used for achieving the goals of SDGs and Seventh Five Year Plan. Its broad acceptability to a range of sectoral activities such as health, rights, education, livelihoods and conflict prevention, and identifies the need to deepen the capacity of radio broadcasters and evaluation, so as to begin the process of developing a rigorous information and communication.

6.3 Awareness building about public services:

CR can create awareness to the common people about government services like postal, cooperative, electricity, transportation, health and family planning, education and mass education, fisheries and animal husbandry, agriculture extension, mass communication, weather, social service, youth development, women development etc. Thus, it will play a vital role to remove divide line between service provider and client (Faroha Suhrawardy, 2009).

6.4 Assist rural farmer:

To assist farmers to increase agricultural production at farm and home level, receiving knowledge of modern technology at their own community using their own language can help to remove hunger and poverty.

6.5 Ensuring citizen charter:
If people's participation in programming and management can be ensured, community radio can be a sustainable platform for people-to-people communication and problem solving mechanism included in connecting the citizen charter of the concept note on digital Bangladesh (Alam, 2009).

6.6 Bridging the gap between rural and urban area:
Community radio reduces gap between rural and urban area to get information and knowledge. This radio facilitates backward people to discuss their own problems.

6.7 Non payable information:
CR can provide non payable information services for all type of people to a particular community based on their own social norms, values and cultural heritage.

6.8 Alert against natural disasters:
Community Radios have been playing a significant role in protecting people's lives and resources by providing updated information on the natural disasters to the people. During the cyclone- Mahasen, Comen and Roanur, the local administration directly shared their instructions through Community Radios to make the local people cautions. Thus the risks of disasters were reduced.

It is assumed that the government wants to make Bangladesh fully digitized by 2021 through application of third generation information and communication technology. Access to information and awareness building at grassroots level through Community based radio is likely to help Bangladesh become a mid-income country, which is the major goal of Digital Bangladesh as envisioned by the present government.

7.0 Concluding Remarks
Community Radio is a medium that gives a voice to the voiceless, serves as mouthpiece of the marginalized and is central to communication and democratic processes within societies.

Community Radio's contribution is pivotal in bringing about changes in power relations between the community people and the government. Community Radio is enabling local people to participate and raise their voices on issues affecting their lives. Among other issues, community radio can bridge the gap between local supply and demand sides of public information. The potentiality of Community Radio contained in this study could help the policymaker craft strategic plans to bring the dream of a Digital Bangladesh come true.

8.0 Recommendations

Following recommendations can be made based on the facts analysis:

- There should be clear and explicit recognition of community broadcasting as a distinct sector.
- There should be a straightforward and transparent process for the allocation of spectrum and the licensing of community broadcasting. License fees should be set at a nominal level so as not to exclude communities from few resources.
- Integrate Community Radio with Vision 2021.
- Install Community Radio stations in RDA, BARD, and BRRI and other research agencies according to policy.
- Include Community Radio in "A home a farm project".
- Community Radio Academy (CRA) should play vital role for capacity building and coordination.

Writer : Md. Abu Sayem, Regional Farm Broadcasting Officer, Agriculture Information Service

References:

Alam, K. (2009). *Community Radio Readiness in Bangladesh: Baseline study findings for a way forward*. Dhaka: Bangladesh NGO's Network for Radio and Communication.

Awami League (2008). *Election Manifesto 2008*, Dhaka: Bangladesh Awami League, Article No. 19.1

Bangladesh Gazette (2008, March 18). *Community Radio Installation, Operation and Broadcasting Policy 2008*. Dhaka: Bangladesh Government Press.

Bangladesh Gazette (2018, February 08). *Community Radio installation, Broadcasting and Operation Policy 2017*. Dhaka: Bangladesh Government Press.

BNNRC (2009). *Handbook: Community Radio for Good Governance and Development*. Dhaka: BNNRC.

De Souza, P.P. (2010). "*Community Radio: Giving voice to the voiceless".* Paper presented at Regional Conference "Progress of Community Radio in Bangladesh, organized by AMARC-AP and BNNRC, Bangalore, 20-24 February 2010.

Faroha Suhrawardy, (2009). *Community Radio for Right to Information, Peoples Participation & Democratization.* Dhaka: BNNRC.

NEFEJ (2004). *Community Radio Support Centre*. RADIO KANNALI, with support from free voice the Netherlands.

Rahman, B. (2010, August 15). *Community Radio in Bangladesh.* Retrieved from http://bazlu.culture360.org/2010/08/15/ community-radio-in-bangladesh/

Reza, S. (2008). "*Mobilizing Communities for Community Radio in Bangladesh: Prospects and Challenges".* Paper presented at the-Regional Conference "Peoples' Voices, People' Participation and Community Radio, organized by AMIC, UNB & BNNRC, Dhaka, 4th May 2008.